সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ

ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক বঙ্গদেশের যাবতীয় স্কুলের জন্য
প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত
[কলিকাতা গেজেট, ২৯শে এপ্রিল, ১৯৪৩]

শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী

উৎসর্গ

পূজনীয় শিল্পাচার্য্য

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি. আই. ই.

মহাশয়েষু

অলোকসামান্য লোকোত্তর পুরুষ রবীন্দ্রনাথকে আপনি যেমন জেনেছেন, তেমনটি বোধ হয় আজ আর কেউ জানেন না। আপনি সে মহাপুরুষের আসল রূপটি অসামান্য শিল্পীর তুলিতে যেমনটি এঁকেছেন তারও তুলনা নেই। আমি একজন নগণ্য গ্রাম্য শিলাইদহবাসী। আমাদের দরিদ্র গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে 'বড়লোক' রবীন্দ্রনাথের যে আসল রূপটি দেখেছি, তারই অপটু ছবি "সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ" পরম শ্রদ্ধাসহকারে আপনার করকমলে তুলে দিলুম।

শিলাইদহ (নদীয়া)
২৫শে বৈশাখ, ১৩৪৯

বিনীত
শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী

কথা-সূচী

চিত্র-সূচী

"আমাদের এই মাটির মা,···এর সোনার শস্যক্ষেত্র,—এর স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে, এর সুখদুঃখময় ভালবাসার লোকালয়ের মধ্যে এই সমস্ত দরিদ্র মর্ত্ত্য-হৃদয়ের অশ্রুর ধনগুলিকে কোলে ক'রে এনে দি:য়ছে। * * আমি এই পৃথিবীকে ভালবাসি,—স্বর্গের উপরে আড়ি ক'রে আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর আরো বেশি ভালবাসি।" (ছিন্নপত্র—পৃঃ ৫৪)

—রবীন্দ্রনাথ

"বহুদিন ধরে' বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হ'তে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশিরবিন্দু॥"

৭ই পৌষ, ১৩৩৬ —স্ফুলিঙ্গ—

ভূমিকা

এই সত্য কাহিনীগুলোকে রবীন্দ্রজীবনীর মধ্যে ঐতিহাসিক পারম্পর্য্য দিয়ে বিচার করলে ঠিক হবে না। একই কাহিনীর সময় বা পটভূমিকা পুরানো লোকদের কাছে কিছু কিছু বিভিন্ন রকমে শুনা যায়,—তবে আসল ঘটনাটা তাঁরা যা বলেন তা একই। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র জীবনের এই রকম আরও সরস সত্যকাহিনী নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে, সেগুলো যদি পরে সংগ্রহ করতে পারি, তবে প্রকাশ করবার ইচ্ছা রইল। এতবড় একজন মহামানবের বাস্তব জীবনের খাঁটি সত্যকার পরিচয় পাবার জন্য সকলেরই কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক, কারণ রবীন্দ্রনাথ সমগ্র বিশ্বে সম্মানিত এবং অভিজাত ধনাঢ্য জমিদার ব'লেই সাধারণের কাছে পরিচিত ছিলেন।

শ্রদ্ধেয় বাল্যবন্ধু রবীন্দ্র-সাহিত্যরসিক ডক্টর শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এম. এ., পি-এইচ. ডি. মহাশয় ছাপার অক্ষরে এই গল্প-সংগ্রহ প্রকাশ ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করেছেন। তাঁকে ছুটো মৌখিক কৃতজ্ঞতা জানাবার চেষ্টা করা বৃথা। দারুণ অশান্তিময় পরিস্থিতির মধ্যে অনেক বাধা অতিক্রম ক'রে প্রকাশকগণ বইখানা রসিকজনকে পরিবেশন করেছেন, সেজন্য তাঁদের আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শিলাইদহ (নদীয়া)
২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৯

শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

মাত্র আট মাসের মধ্যেই এই বইএর প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হ'ল। এতে একটা কাহিনী যোগ ক'রে দেওয়ায় বইএর আকার বেড়ে গেল, কিন্তু এ দুর্মূল্যের দিনেও দাম যা বাড়ানো 'ল তা অতি সামান্য।

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

মাত্র দুই বৎসরে এই বইএর দুইটি সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হ'ল। এতে আরো একটা কাহিনী প্রবন্ধাকারে যোগ ক'রে দেওয়া গেল এবং কিছু পরিবর্দ্ধনও করা গেল।

শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে ১৯১৬ সালে শিলাইদহে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই সময়কার আঁকা শিলাইদহের কয়েকজন অধিবাসীর ও নানা দৃশ্যের যে ছবিগুলো বিশ্বভারতী কলাভবনে সুরক্ষিত ছিল তারই পাঁচখানা ছবি তিনি এই বইতে ছাপতে অনুমতি দিয়েছেন। তাঁর স্নেহের ঋণ চিরস্মরণীয় হয়ে রইল।

পরিচিতি

"সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথে"র লেখক শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী সাহিত্যসমাজে সম্পূর্ণ অপরিচিত। তিনি ইতিপূর্ব্বে কখনো কিছু লিখেছেন ব'লে আমি'ত জানিনে। আমি তাঁকে পাঠক-সমাজে পরিচিত করবার উদ্দেশ্যে এই ভূমিকা লিখছি।

শিলাইদহে ঠাকুরবাবুদের কুঠী-বাড়ী, কাছারী-বাড়ী ও ঠাকুর-বাড়ী ব্যতীত একটি ছোট ভদ্রপল্লী আছে। শচীন্দ্র অধিকারী এই শিলাইদহ গ্রামের অধিবাসী এবং অধিকারী-পরিবার ঠাকুর জমিদারদের সঙ্গে নানা রকমে সংশ্লিষ্ট। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা লিখেছেন, কিন্তু এ পুস্তিকায় জমিদার হিসেবে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কতকগুলি ছোট ছোট গল্প সন্নিবিষ্ট হয়েছে,—যা জানবার সুযোগ একমাত্র স্থানীয় লোকেরই হ'তে পারে। কবি রবীন্দ্রনাথ, দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষাচার্য্য রবীন্দ্রনাথ,—লেখক এসব বিষয়ে একটি কথাও বলেন নি।—বলেছেন শুধু প্রজাদের সঙ্গে তাঁর সহৃদয় ব্যবহারের কতকগুলি কাহিনী, যার থেকে তাঁর প্রজা-বাৎসল্য ও কৌতুক-প্রিয়তা ফুটে উঠেছে। আবার অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ়তারও পরিচয় পাওয়া যায়,—পুণ্যাহ সম্বন্ধে তাঁর প্রবর্ত্তিত নববিধানে। গল্পগুলি সবই সুলিখিত ও সুখপাঠ্য এবং এক হিসেবে বহুমূল্য, কারণ এতে রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের

একটি দিক লোকের চোখের সুমুখে ধরা হয়েছে,—যা লেখক ভিন্ন অপর কারো পক্ষে জানবার সম্ভাবনা খুব কম।

এই বইখানি আমি সকলকে পড়তে অনুরোধ করি। কারণ ছোটখাট বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিসুলভ মহত্ত্ব ও সহজ মনুষ্যত্ব যেমন প্রকাশ পেয়েছে, অনেক বড় জীবনীতেও তা হয় না।

শান্তিনিকেতন
১লা জুলাই, ১৯৪২

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ

সূচনা

রবীন্দ্রনাথ সার্থকনামা পুরুষ। সূর্য্যের মতই তিনি ফুলকে ফুটিয়ে, বনকে শ্যামল ক'রে, ঊষর মাটিকে শস্যসম্ভারে সাজিয়ে, আকাশে ইন্দ্রধনু রচনা ক'রে, নদনদীতে আকুল কলপ্রবাহ এনে, ভাববন্যায় দেশ-কাল-জাতির গণ্ডী ভাসিয়ে দিয়ে, প্রতিভার খরতাপে জড়কে জীবন্ত ক'রে অস্তাচলে গেছেন। শতাব্দীর সূর্য্যাস্ত তাই এত গরিমাময়—মহিমাময়।

রবির কিরণ শুধু প্রাসাদচূড়ায়, পর্ব্বতশৃঙ্গে, বিশাল-তাল-তমালের মুকুটেই জ্যোতির্লোক সৃষ্টি করে নি, তাঁর কিরণ কৃষকের কুটীরে, পল্লীর মাঠে-ঘাটে, ধানের ক্ষেতে, বাংলার দীঘি-সরোবরে, বটতলে, দরিদ্র গৃহস্থের আঙিনায়, তুলসী-তলায়ও প্রেমের আলো জ্বেলেছিল; সেখানেও সরল, [illegible],

নির্জ্জীব মানবাত্মার প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করেছিল অতি গভীরভাবে। তাইতেই এত বড় বিশাল বৈচিত্র্যময় রসঘন সাহিত্য সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল।

বংশ-গরিমায়, পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক আভিজাত্যে, উচ্চ সভ্যতার আবেষ্টনে এবং রাজরাজেশ্বরের মত মহাসম্মানের উচ্চশিখরে ব'সে রবীন্দ্রনাথ সাধারণের নাগালের বহু ঊর্দ্ধে ছিলেন—এ ধারণা অতি স্বাভাবিক; কিন্তু এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষটির সহজ সরল অতি সাধারণ আটপৌরে আসল রূপটি যাঁরা দেখবার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা মুগ্ধ হয়েছেন, ধন্য হয়েছেন। তিনি খাঁটি বাঙ্গালীর মত পল্লীসুলভ সেকেলে দরদ নিয়ে আমাদের মধ্যে গ্রামে গ্রামে তাঁর অনন্ত রহস্যময় চিরসুন্দরকে পাবার আশায় ঘুরেছেন,—আমাদের সঙ্গে হাসিখুসি গল্পগুজব রংতামাসা করেছেন; কেউ তাঁকে ভয় করে নি, সঙ্কোচ করে নি,—মনেও ভাবে নি যে তিনি ধনী, সম্ভ্রান্ত, মহাসম্মানী জমিদার। এমন কি, তিনি যে সহরবাসী সভ্যতাভিমানী বড়লোক,—একথাও কোন গ্রাম্যলোক কখনো চিন্তা করবার অবকাশ পায় নি।

গ্রামের রাস্তায় তিনি এত দ্রুত হাঁটতেন যে অনেক সাধারণ বলিষ্ঠ পল্লীবাসী তাঁর সঙ্গে হেঁটে উঠতে পারত না। প্রজারা জমিদারীর কাজের অবসরে নির্ভয়ে তাঁর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিত। বুড়োরা তাঁকে প্রায়ই 'তুমি' 'তুই' বলত। তাদের সঙ্গে

যখন তাঁর গল্প ও উচ্চহাস্যের মধুচক্র জমে' উঠত, তখন বাইরের কেউ দেখলে নিশ্চয়ই অবাক হ'ত যে ইনিই কি ঠাকুর-বংশের সূর্য্য সেই রবীন্দ্রনাথ!

তিনি ছিলেন মস্ত সম্ভ্রান্ত জমিদার। সংসারে অসাধারণ বড়লোক যাকে বলে তিনি তাই ছিলেন। কিন্তু আমরা আমাদের পল্লীর মধ্যে যখন দল বেঁধে তাঁকে নিয়ে 'রাখীবন্ধন' উৎসব করেছি, বালক সৈন্যদল নিয়ে যখন তাঁর দুই হাতে কব্জী থেকে কনুই অবধি অসংখ্য লালসূতো বেঁধে নেচে-কুঁদে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করেছি, তখন তিনি মস্ত বড়লোক একথা মনেও করি নি! যখন তিনি গ্রামের ছেলেদের দৌড়, লাফ, কুস্তির প্রতিযোগিতা দেখে হেসে হাততালি দিতেন, কাউকে ঠাট্টা ক'রে হো-হো ক'রে হেসে সবাইকে হাসাতেন, তখন শিশুপ্রিয় রবীন্দ্রনাথকে কেউ মহামানী মহাধনী ব'লে মনেও করতে পারে নি। তিনি সাধারণের নিকট দুষ্প্রাপ্য ছিলেন না। পল্লীর সেকেলে সুমধুর সামাজিকতা, শিষ্টাচার, রঙ্গপ্রিয়তা এযুগেও তাঁর বাস্তবজীবনে আনন্দলোকের কি অপূর্ব্ব সমারোহের সৃষ্টি করেছিল, তা আমার এই গল্পগুলোতে বলতে চেষ্টা করেছি। তাঁর সহজ গ্রাম্য আটপৌরে রূপটি আমার প্রাণের নিদ্‌মহলে এখনো আরতির ঘৃতদীপটির মতই জ্বলছে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন খাঁটি বাঙ্গালী, পল্লীমায়ের আদুরে দুলাল। তিনি তাঁর সোনার বাংলামায়ের কোলে ব'সে কি আনন্দ-বেদনায়

বাউলের সুরে গেয়েছেন, "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।" সেই দরিদ্রা মায়ের মুখের দিকে চেয়ে বিভোর হয়ে গেয়েছেন, "ওমা, তোমার হাসি আমার প্রাণে লাগে সুধার মত,—মরি হায় হায় রে!" খাঁটি বাঙ্গালী রবীন্দ্রনাথ দেশ-মাতার জন্য "বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল, পুণ্য হউক,—সত্য হউক" ব'লে ভগবানের কাছে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেছেন: "ফিরে চল্ মাটির টানে" ব'লে বাংলার ছেলেদের ঘরমুখী হতে আহ্বান করেছেন। দেশ-বিদেশের বড়লোকদের অজস্র সম্মানের বোঝা বয়ে, অবসন্ন বিরক্ত হয়ে, অসুস্থ মনকে তাজা করবার জন্য কতবার তিনি পল্লীমায়ের বুকে ছুটে এসেছেন! শুধু তাই নয়, তিনি পরজন্মে পল্লীর মধুবৃন্দাবনে গোপ-বালক হয়ে জন্মাবার সাধ করেছেন। তাঁর "জন্মান্তরের" কামনা—

"আমি ছেড়েই দিতে রাজী আছি সুসভ্যতার আলোক,
আমি চাই না হতে নববঙ্গে নবযুগের চালক,
আমি নাই বা গেলাম বিলাত্,
নাই বা পেলাম রাজার খিলাত্,
যদি পরজন্মে পাইরে হতে ব্রজের রাখাল বালক,
তবে নিবিয়ে দেবো নিজের ঘরে সুসভ্যতার আলোক।"

প্রাচীন বাংলার যা মর্ম্মবাণী, খাঁটি নিজস্ব সম্পদ, যা শাশ্বত, সত্যিকার অন্তরের ধন, তাকে তিনি আজীবন সমস্ত প্রাণ দিয়ে

ভালবেসেছেন—পূজো করেছেন। তাঁর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মেটাবার জন্য পরজন্মে বাংলার বৃন্দাবনে বাঁশী আর লাঙল নিয়ে কোন্ ভাগ্যবান নন্দের আলয়ে এসে তিনি অবতীর্ণ হবেন, সেদিনের জন্য আমরা প্রতীক্ষা করছি।

পল্লীর কোন্ নিভৃত পাড়ায়, কোন্ নদীর ঘাটে, কোথায় কোন্ বটতলে, কোন্ গৃহকোণে দুই বিঘা জমির মালিক উপেন, পুরাতন ভৃত্য কেষ্টা, মাসীর বুকের ধন রাখাল, স্বামিহারা মল্লিকা, শ্যামল মেয়ে গিরিবালা, খঞ্জনী-হাতে ঝুঁটিবাঁধা বোষ্টমী, কুড়ি টাকা মাইনের পোষ্টমাষ্টার, উদ্ধত প্রজা ধনঞ্জয় বৈরাগী, একতারা হাতে কণ্ঠিগলায় বাউল, হালদার গোষ্ঠীর ছোট-বাবু বনোয়ারী, নিঃসন্তান জয়কালী ঠাকরুণ, চিরদুঃখিনী বিন্দুবাসিনী, স্নেহকাঙালিনী কাকিমা, গোবেচারী রামকানাই, —এই রকমের কতশত বিচিত্র সাধারণ গ্রাম্য নরনারী যে তাঁর দরদী প্রাণের অন্তরালে নিরন্তর ভিড় ক'রে দাঁড়াত তার অন্ত নেই। তাঁর পূর্ব্বে এদের সুখ-দুঃখের বাস্তব কাহিনী এমন ক'রে আর কেউ চিত্রিত করেন নি, এতখানি প্রাণের দরদ ঢেলে দেন নি। সাহিত্যে এরা সবাই একরকম অপাংক্তেয় ছিল, রবীন্দ্রনাথ এদেরই নিয়ে হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা মিশিয়ে একটা প্রাণবান সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। এরা ড্রইংরুমে ব'সে পিয়ানো বাজায় না, চা খায় না, টেনিস খেলতে খেলতে খিল-খিল ক'রে হাসে না, শিমলা-শৈলে বিহার করতে যায়

না, বেয়ারাকে হুকুম করে না, ইংরেজী বুক্‌নী ঝাড়ে না। এরা ডাবা হুঁকায় তামাক খায়, খালি পায়ে মাঠে যায়, হরির লুটে নেচে-কুঁদে গান গায়, তিলক কাটে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না, জমিদারের কাছে হাতজোড় করে, আবার লাঠিও ধরে, মাতুরে শুয়ে জ্বরে কোঁকায়। এরা প্রকৃতিমায়ের আদুরে দুলাল, গেঁয়ো মানুষ—সহজ, সরল, সেকেলে। এরাই সাহিত্যের দরবারে সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী, এরাই তাঁর অপূর্ব্ব সাহিত্যের মানস পুত্র-কন্যা।

দীর্ঘকাল পল্লীজীবন যাপন ক'রে তিনি পল্লীর নিরক্ষর বাউল, ফকির, কীর্ত্তনীয়া, কবি, তরজাওয়ালা, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের গান কী অপূর্ব্ব রসানুভূতি নিয়ে শুনেছেন,—তাদের সঙ্গে প্রাণ খুলে আলাপ করেছেন! কোন্ পল্লীতে কোন্ মরমী, গুণী, প্রেমিক লোক আছেন,—কোন্ অশিক্ষিত গ্রাম্য কবি আপন মনে গান গেয়ে তন্ময় হয়েছেন, তাঁদের খোঁজখবর তাঁর কাছে কখনও অবিদিত থাকত না। তাঁদের তিনি চুম্বকের মত আকর্ষণ করেছেন। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মত তাঁদের খুঁটিনাটি সরল জীবনযাত্রারও যেন তিনি সঙ্গী হয়েছেন।

নৌকার মাঝি মেঠো সুরে বিরহের গান ধরেছে,—'তার প্রেমিকা যুবতী মন ভারী করেছে, তার মান ভাঙ্‌বার জন্য পাবনা থেকে দু'টাকা দামের পাছাপেড়ে সাড়ী আনবার প্রচেষ্টা', পদ্মায় পালতোলা নৌকায় মাঝিরা সারি গান গেয়ে

চলেছে, ইস্কুলের মাষ্টার তাঁর কাছে এসে আবেদন করছেন, পল্লীবধূরা পদ্মার ঘাটে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাবার জন্য এসেছে, মহিষ পাঁকের মধ্যে নাক ডুবিয়ে আরাম করছে, স্নানের ঘাটে মা ছেলেকে শাসন করছে, খেয়ার মাঝি লোকজন গরু-মহিষ পারাপার করছে, গরুর রাখাল কাজ ফেলে বটের ছায়ায় বাঁশী বাজাচ্ছে,—সাহিত্যে এদের এমন মহিমাময় স্থান রবীন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথমে দিয়েছেন এবং এমন পরিপূর্ণভাবে দিয়েছেন যে, সে সব চিত্র তাঁর মত সহজ সত্যসন্ধ মানুষের সাহিত্যে আপন আপন বৈশিষ্ট্যে ঝল্‌মল করছে। তাঁর সাহিত্যের ভাষা সহজ সরল—সাধারণের প্রাণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সরল অভিব্যক্তি। তাই সে ভাষা অনুকরণীয়,—সে ভাষা প্রাণের ভিতর দিয়া মরমে বিঁধিয়া বসে।

মানুষের কবি সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ শুধু সাধারণ গ্রাম্য অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত লোকদের ভালবেসে, ভাববিলাসীদের মত শুধু তাদের কাহিনী লিখে অমৃত পরিবেশন ক'রেই ক্ষান্ত হন নি—তাদের দুর্দ্দশা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা তাঁর অন্তরে নিরন্তর বেদনা দিয়েছে, এর প্রতীকারের জন্যই তাঁকে কর্ম্মযোগী হতে হয়েছে।

জমিদার হিসাবে গরীব চাষীদের মর্ম্মবেদনা রবীন্দ্রনাথ কী গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন, তা শুনলে তাঁকে দারুণ সাম্যবাদী ব'লে মনে হবে। তিনি ম্যানেজারকে বেদনাতুর

কণ্ঠে অনেক সময় বলতেন—“এই গরীব চাষীরা প্রায়ই কলাই-সিদ্ধ খেয়ে দিন কাটায়, একজনের ভাত তিনজনে বেঁটে খায়, শীতকালে খড়ের গাদায় রাত কাটায়, চরের শুক্‌নো ঝাউ দুই ক্রোশ দূরে বয়ে বেচে চারটিমাত্র পয়সা পায়,—আমি অনেক দেখেছি নিজের চোখে। এদের উপর যেন কোন রকমেই অত্যাচার না হয়। এদের পালন করাই তোমাদের ধর্ম্ম। ধর্ম্ম ব'লে আর কোন জিনিস নেই জেনো।”

সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ তাঁর “রাশিয়ার চিঠিতে” নর-নারায়ণের বন্দনা গান গেয়ে নিজের দেশের হীনাদর্শ বেশী ক'রে অনুভব করেছেন। বুকের মধ্যে সেই অপরিসীম দরদ ও ব্যর্থতার জ্বালা নিয়ে তিনি পরপারে চ'লে গেছেন, রেখে গেছেন—তাঁর বড় সাধের “স্বদেশী সমাজ” গড়বার জন্যে তাঁর দেশবাসীর নিকট সনির্ব্বন্ধ আবেদন।

তিনি সাহিত্যে বা দেশের কাজে কোনদিনই ভাববিলাসী ছিলেন না। সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ বহুবার স্বচক্ষে দেখেছেন, আগুনে এক গৃহস্থের বাড়ী পুড়ে যাচ্ছে, গ্রামে আগুন নেবাবার জল নেই,—পানীয় জলের অভাবে কত লোক মরতে বসেছে, কিন্তু জল পাবার জন্য চেষ্টা নেই,—চিকিৎসার অভাবে গ্রাম উজাড় হচ্ছে, তবু কোনো প্রতীকারের চিন্তা পর্য্যন্ত নেই। “অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই” ব'লে তিনি দেশের নেতাদের সচেতন করবার জন্য কথায় ও কাজে যে অসাধারণ

চেষ্টা করেছেন তার তুলনা নেই। বাংলাদেশে প্রকৃত পল্লী-সংস্কারের ব্রত সত্যিকার গঠনমূলকভাবে তাঁর আগে আর কেউ গ্রহণ করেন নি। তিনি নিজের শক্তির দিকে একেবারেই তাকান নি,—কারো সমালোচনায় প্রত্যুত্তর করেন নি। দেশের অবজ্ঞাত অসহায় জনসাধারণের জন্য এতবড় ব্যয় ও কষ্টসাধ্য কাজ তিনি নিজেই যথাসাধ্য করবেন ব'লে পণ করেছিলেন। বাংলাদেশের শতকরা নব্বুই জন নরনারী পল্লীতে "বড় দুঃখ বড় ব্যথায় কষ্টের সংসারে" দিনের পর দিন জীবনগুলোকে ভাগাড়ের দিকে নিয়ে চলেছে তা সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ সত্যের আলোকে প্রাণের গভীর অনুভূতি মিশিয়ে দেখে ব্যাকুল হয়েছিলেন,—তাদের জন্যে অনেক দুঃখ বরণ করেছিলেন।

সেই সহজ মরমী রবীন্দ্রনাথের দেখা পেয়েছিলাম নিজের সৌভাগ্যে ও সুকৃতিতে তাঁরই সাধের সাহিত্যরস-সাধনার তীর্থস্থান ও কর্ম্মস্থান শিলাইদহের একজন সামান্য অধিবাসী-রূপে। সে সব কাহিনী আমাদের অন্তরের মণিকোঠায় এখনও জেগে রয়েছে। অনেক কাহিনী গ্রামবৃদ্ধদের মৃত্যুতে আঁধারে মিশে গেছে, কোন কোন কাহিনী বিস্মৃতির তলা থেকে কুড়িয়ে উদ্ধার করা গেছে। হয়তো দু'পাঁচ বছর পরে সে সব প্রচ্ছন্ন সত্য কাহিনী একেবারেই হারিয়ে যাবে বা অতি প্রাচীন-কাহিনীর মত গল্পে পরিণত হবে। কয়েকটি কাহিনী আমার নিজের জানা ও গ্রামবৃদ্ধদের নিকট থেকে সংগ্রহ করা,—সন-

তারিখের হিসাব হয়তো অনেক বিবরণেই সঠিক হবে না। এই রকমের নানা সত্য কাহিনী অনেক লোকের কাছে ছড়িয়ে রয়েছে যা সংগ্রহ করলে একটা মধুচক্র রচনা করা সম্ভব হতে পারে।

তবু এই কাহিনীগুলোই অলোকসামান্য মহাপুরুষ রবীন্দ্রনাথের অন্তরের সত্য পরিচয়। কোন কোন কাহিনীর নায়ক-নায়িকাকে একটু প্রচ্ছন্ন রাখবার জন্য নামধাম গোপন করা হয়েছে।

এই বাংলার মাটির মানুষ—খাঁটি মরমী রবীন্দ্রনাথের সত্য পরিচয় কিছুদিন পরে দেবার চেষ্টা হয়তো ব্যর্থ হবে; এজন্য অমৃতময় পুরুষসিংহের গোপন অন্তরলোকের খবর যতটুকু পেয়েছি, তাই আজ বাঙ্গালীর হৃদয়ের দ্বারে পরিবেশন ক'রে শুনি সেই সহজ মানুষের সহজ বাণী—

"সহজ হবি, সহজ হবি, ওরে মন সহজ হবি,—
আপন বচন-রচন হতে বাহির হয়ে আয় রে কবি।
সকল কথার বাহিরেতে ভুবন আছে হৃদয় পেতে,
নীরব ফুলের নয়নপানে চেয়ে আছে প্রভাত রবি।"

শিরোমণি মশাই

"—" চক্রবর্ত্তী ছিলেন গ্রাম্য পুরোহিত—সহজ, সরল, হঠাৎ-রাগী, অল্পে-সন্তুষ্ট, গরীব মানুষটি। যজমানী-বৃত্তিতে তাঁর সংসার কোনমতে চলত।

কিন্তু আর চলে না। লাউ-কুমড়ো শাকের ডাঁটা বাদে সবই কিনে খেতে হয়। একরত্তি জমিজমা নেই, শুধু যজমান-বাড়ী ফুল ফেলে কি আর সংসার চলে? চক্রবর্ত্তী-মশাই কিছু জমিজমা করবার জন্য উঠে প'ড়ে লাগলেন—কিন্তু জমিজমা করতে হলে ত টাকা চাই! তাঁর টাকা কই?

তাঁর শুধু টাকারই অভাব নয়, জমিজমা করতে হলে যে বিষয়বুদ্ধির দরকার, তদ্বির-কৌশলের দরকার তারো অভাব। সে সব তিনি মোটেই জানতেন না,—জানতেন কেবল গ্রামে গ্রামে বাড়ী বাড়ী ঘুরে ষষ্ঠীপূজো, লক্ষ্মীপূজো, মনসাপূজো, শ্রাদ্ধশান্তি ইত্যাদি ক'রে যে যা দেয় তাই নিয়ে পোঁটলা বাঁধতে।

সংসারে ছেলেপিলের আবির্ভাব হ'ল। সংসারের অভাব কিছুতেই মেটে না দেখে শেষে চক্রবর্ত্তী ঠাকুরবাবুর ম্যানেজার-মশাইকে খুব কাঁদাকাটি ক'রে ধরলেন; তহশীলদারবাবু ও

আমীনবাবুদের পেছনে পেছনে অনেকদিন ঘুরলেন ; কিন্তু বিনা পয়সায় জমি পাওয়ার হদিস্ আর মিলল না,—ঘোরাঘুরিই সার হ'ল। বহুদিন এখানে সেখানে আমলাবাবুদের খোসামুদি ক'রে শেষে চক্রবর্ত্তী হতাশ হয়ে পড়লেন। তাঁর মেজাজ গেল বিগ্ড়ে,—বাড়ীতে ঝগড়াঝাঁটি সুরু হ'ল। শেষে গ্রামের বুদ্ধিমানেরা তাঁকে পরামর্শ দিলেন—যদি খোদ বাবু-মশাইকে ধরতে পার তবে তোমার আশা পূর্ণ হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহের জমিদার। প্রজারা তাঁকে 'বাবু-মশাই' বলত। চক্রবর্ত্তী যেন আঁধারের মাঝে আলো দেখতে পেলেন,—বাবু-মশাইকে একবার ধরতেই হবে, কিন্তু সে তো বড় সোজা কথা নয়। পাইক, পেয়াদা, বরকন্দাজ, আমলা-ফয়লা ডিঙিয়ে বাবু-মশায়ের কাছে হাজির হওয়া তাঁর সাধ্যে বুঝি কুলায় না।

তখন রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে পদ্মার উপরে বোটে থাকতেন। বোটের উপরেই জমিদারীর কাগজপত্র দেখতেন, প্রজার অভাব-অভিযোগ শুনতেন, বিচার-ব্যবস্থা করতেন। মাথায় লাল-পাগড়ী-বাঁধা চক্‌চকে তক্‌মাওয়ালা বরকন্দাজেরা চব্বিশ ঘণ্টা লাঠি-হাতে তাঁর বোটের কাছে মোতায়েন থাকত। চক্রবর্ত্তী বাবু-মশায়ের বোটের কাছে কাছে ঘোরেন, হা-পিত্তেসে সব কাণ্ডকারখানা দেখেন, কিন্তু বাবু-মশায়ের কাছে উপস্থিত হবার কোনই উপায় ঠাওরাতে পারলেন না।

চক্রবর্ত্তী এইভাবে পাঁচ-ছ' দিন নিরাশ-হৃদয়ে ঘুরে ঘুরে আবিষ্কার করলেন যে, বাবু-মশাই যখন একা নির্জ্জনে ব'সে লেখাপড়া করেন, সেই সময়ে যে কোনো উপায়ে তাঁর সাম্‌নে হাজির হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু তারো বাধা ঢের, বরকন্দাজেরা প্রায় সব সময়েই বোটের চারদিকে হাজির থাকে, আর তা'রা চক্রবর্ত্তীকে একেবারে পাগল ঠাওরিয়েছে। এখন উপায় কি? চক্রবর্ত্তী অনেক ভেবে ভেবে মরিয়া হয়ে এক মতলব পাকালেন।

দুপুর বেলা। ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ,—বেলা আন্দাজ দুইটা। বাবু-মশায়ের বোটখানা সে সময় তীরে বাঁধা ছিল না, পদ্মার প্রায় মধ্যখানে নোঙ্গর করা ছিল। চক্রবর্ত্তী সেদিন মনের দুঃখে অনাহারে আছেন। বাবু-মশাই নির্জ্জনে বোটের মধ্যে লেখাপড়া করছেন। চারিদিক নির্জ্জন। এমন সময়ে হঠাৎ বোটখানা ভয়ানক রকম দুলে উঠল। বাবু-মশাই বোটের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখেন, কে যেন বজরার একপাশ ধ'রে ঝুলে প'ড়ে কাঁপছে। তিনি ব্যস্তসমস্ত হয়ে বজরার বাইরে এলেন,—মাঝিদের ডেকে লোকটাকে ভিতরে আনালেন। তখন লোকটা কাঁপছে।

বাবু-মশাই অবাক হয়ে গেলেন। লোকটি যে প্রায়ই বোটের কাছে ঘোরে তা টের পেলেন। ভিজে কাপড় ছাড়িয়ে আশ্বাস দিয়ে বললেন—"ব্যাপার কী?"

চক্রবর্ত্তী মনের দুঃখে অভিমানে একেবারে হাউ-হাউ ক'রে কেঁদে ফেললেন। পরে আস্তে আস্তে তাঁর অভাব-অভিযোগের বিষয় সবিস্তারে বললেন। তাঁর যজমানী-বৃত্তির কাহিনীও সাড়ম্বরে বর্ণনা ক'রে বললেন—"হুজুর, ফুল-জল খুবই ছিটাই, মন্তরও পড়ি খুব, কিন্তু ট্যাঁকে পয়সা আসে না,—আসে কিছু চাল, কলা, নাড়ু, বড়ি আর ভিখিরি-বিদায়ের মত দু'চার আনা মাত্র। টাকা কোথায় পাব যে জমি কিনব ?"

রহস্যপ্রিয় বাবু-মশাই কৌতূহলী হয়ে গল্প জুড়লেন—"তুমি লেখাপড়া তেমন জানো না,—সংস্কৃতও শেখ নি, তবে অত মন্ত্র পড় কেমন ক'রে ?"

চক্রবর্ত্তী সদর্পে বললেন—"হুজুর, দেহে ব্রহ্মরক্ত রয়েছে, মন্ত্র পড়ায় কেউ আমায় হারাতে পারে না। আমি নীলমাধব পণ্ডিতের কাছে সাকৃরেদী ক'রে একেবারে দশকর্ম্মান্বিত হয়েছি। এতদ্দেশের 'হেলেরই' মহলে আমি বিশ্বামিত্র ঋষি, সে-সব পাড়ায় আর কোন পুরুতের কল্‌কে পাবার যো নেই !"

বাবু-মশাই খুব একচোট হেসে নিলেন, বললেন—"আচ্ছা বেশ, একটা মন্ত্র মুখস্থ ব'লে আমায় শোনাও দেখি।"

চক্রবর্ত্তী আনন্দে আত্মহারা হয়ে কার বাড়ীতে বিয়ের মন্ত্র পড়াবার সময় কোন্ পুরোহিতের তিনি ভুল ধরেছেন, নীলমাধব ভট্‌চাজ, ললিত পণ্ডিত কবে কি কারণে তাঁকে দশকর্ম্মান্বিত ব'লে সুখ্যাতি করেছেন, এক রাত্রে তিনি

কতগুলো গাঁয়ের কতগুলো লক্ষ্মীপূজো সারতে পারেন, সেই সব কাহিনী সাড়ম্বরে শুনাতে আরম্ভ করলেন।

এইবার মন্ত্র শোনাবার পালা। চক্রবর্ত্তী কেশে গলা পরিষ্কার ক'রে পৈতে হাতে জড়িয়ে, সুরু করলেন—"হুজুর, সব দেবতার আগে গণেশের পূজো। তিনি সিদ্ধিদাতা কিনা—তাই গণেশের ধ্যান বলছি।"

এই ব'লে চক্রবর্ত্তী হাত দুখানা জোড় ক'রে "খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং" থেকে আরম্ভ ক'রে সেই অত্যন্ত লম্বা সমাসবদ্ধ কথাগুলো একেবারে আস্ত রেখে মন্ত্র আওড়াতে সুরু করলেন। তাঁর বড় বড় চোখ দুটো আরো বড় আর লাল হয়ে উঠল,—দাড়ি-কমা নেই, প্রায় একনিশ্বাসে কয়েকবার টিকিশুদ্ধ মাথাটাকে সজোরে ঝাঁকি দিয়ে গণপতির দীর্ঘ ধ্যান আউড়ে একেবারে হাঁফিয়ে পড়লেন।

বাবু-মশাই হেসে অস্থির হয়ে উঠলেন। হুহুঙ্কারে মন্ত্র আওড়ানো শেষ হলে তিনি হেসে বললেন—"তুমি এই মন্ত্রের মানে জানো?"

চক্রবর্ত্তী বললেন—"আজ্ঞে হুজুর, মুখ্যসুখ্য লোক, তাই ব'লে কি এটা জানিনে?"

এই ব'লে লম্বা হাত দুটিতে নানান্ কসরৎ ক'রে, "লম্বোদর গজেন্দ্রবদনং"-এর পেট এবং শুঁড়ের আকৃতিটা বুঝিয়ে, "দন্তাঘাতবিদারিতারি" কথাটার অদ্ভুত আক্রমণোদ্যত

বিঘ্নবিনাশনের পরাক্রম অঙ্গ-ভঙ্গী সহকারে প্রকাশ ক'রে দেখিয়ে দিলেন।

তাঁর মুখে ও শরীরে সিদ্ধিদাতার মাহাত্ম্য এমন বিরাট ও বিকট হয়ে প্রকটিত হ'ল যে, বাবু-মশাই চক্রবর্ত্তীর আস্ফালন এড়াবার জন্যে একটু পিছিয়ে ব'সে খুব হাসতে লাগলেন।

চক্রবর্ত্তী রণজয়ী বীরের মত হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন—"এসব সাক্‌রেদী করা বিদ্যে হুজুর, কোন তর্কালঙ্কারেরও এতে ভুল ধরবার সাধ্যি নেই।"

চক্রবর্ত্তী ছাড়বার পাত্র নন,—বাবু-মশায়ের আমোদ দেখে আবার শিবঠাকুরের বলদবাহন সমেত স্তুতি জুড়ে দিলেন অপূর্ব্ব দেবভাষায়। তার পরে দুর্গার স্তব। সেই কাঠের তৈরী ক্ষুদ্র বোটের মধ্যে যেন সত্যিকার শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই বেধে উঠল। চক্রবর্ত্তী আত্মপ্রসাদের উৎসাহে মরিয়া হয়েছেন; চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখ দিয়ে থুথু পড়ছে, হাত-পা ছুঁড়ে, শিখা দুলিয়ে, মন্ত্রের অদ্ভুত একটানা বিকট আবৃত্তিতে সমস্ত দেবদেবীগণকে সেই অল্পপরিসর স্থানে বাহনাদিসহ হাজির ক'রে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। পরে বুক চেপে ধ'রে হাঁফাতে হাঁফাতে কাশতে কাশতে একেবারে অস্থির হয়ে পড়লেন। হাঁফানি যদি বা থামল, কাশি আর থামতে চায় না।

রঙ্গপ্রিয় বাবু-মশাই ব্যাপার দেখে একটু স'রে বসেছিলেন। এইবার হাসি থামিয়ে কাছে এসে বললেন—"বেশ, বেশ!

তুমি যে-সে পণ্ডিত নও,—একেবারে শিরোমণি মশাই। তোমাকে আজ থেকে আমি 'শিরোমণি মশাই' উপাধি দিলাম; দেখো, মন্ত্রে যেন কেউ তোমাকে হারাতে না পারে।"

চক্রবর্ত্তী স্বয়ং বাবু-মশায়ের প্রদত্ত অতবড় উপাধি-ভূষণে ভূষিত হয়ে আনন্দে সকল দুঃখ ভুলে গেলেন। কাশির ধমক বহুকষ্টে থামিয়ে বিজয়গর্ব্বে বাবু-মশাইকে প্রণাম ক'রে আনন্দে আটখানা হয়ে হাতজোড় ক'রে চক্রবর্ত্তী বললেন—"হুজুর, পেটে খেলে পিঠে সয়। কি খেয়ে মন্ত্রতন্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করব? হুজুর পরম দয়ালু। একটি পয়সা আমার সম্বল নেই। আমাকে পাঁচ বিঘে জমি বিনা নজরে না দিলে আমি না খেয়েই মরব।"

বাবু-মশাই চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন; শেষে চক্রবর্ত্তীর খাওয়া হয় নি জেনে, একটা কাগজে ম্যানেজারের বরাবর নিজ হাতে হুকুম লিখে দিলেন। হুকুমটা খুব পরিষ্কার মনে নেই, তবে এই রকম—

"শিরোমণি মহাশয়কে (চক্রবর্ত্তীকে) পাঁচ বিঘা ভাল জমি বিনা নজরে দিবে। যাতে জমিটা এ বেচারী ভোগ করতে পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিবে।"

শিরোমণি মশাই সেদিনের মত চ'লে গেলেন। পরদিন প্রভাতে সেই হুকুমনামা ম্যানেজারবাবুকে দিতেই সকলে একেবারে অবাক।

শিরোমণি মশাই অত্যন্ত হাসিখুশি হয়ে তাঁর রাজদর্শনের কাহিনী ও গণেশের স্তব সবাইকে শুনিয়ে দিলেন। যে শোনে সেই হাসে। বাবু-মশাই নিজ হাতে চক্রবর্ত্তীকে 'শিরোমণি মশাই' ব'লে লিখেছেন দেখে, তাঁর রঙ্গপ্রিয়তায় সবাই অবাক হয়ে গেল। বিনা নজরে অল্প বার্ষিক খাজনায় পাঁচ বিঘে উৎকৃষ্ট জমি তিন দিনের মধ্যে চক্রবর্ত্তীর প্রাপ্তি হয়ে গেল!

ছ'-সাত মাস পরে একদিন বাবু-মশাই বোট থেকে কাছারীর দিকে আসছেন,—সঙ্গে আমলা-প্রজায় বহু লোক। পথেই শিরোমণির সঙ্গে দেখা। এত লোকের সাক্ষাতে হেসে হেসে বাবু-মশাই নিজেই আগে সম্ভাষণ করলেন—"কেমন শিরোমণি, ভাল ত?"

শিরোমণি প্রণাম ক'রে সঙ্গে সঙ্গে চললেন। বাবু-মশাই হাসিমুখে শিরোমণির কুশলবার্ত্তা নিলেন, আবার তাঁর বোটে গিয়ে নূতন নূতন স্তব শুনাবার জন্য বললেন। শিরোমণি প্রণাম ক'রে বিদায় হলেন। অতগুলো লোক বাবু-মশাই আর শিরোমণির এই সহৃদয় আলাপে মুগ্ধ হয়ে গেল।

দু'চার দিন পরে জানা গেল শিরোমণি বাবু-মশায়ের দ্বিতীয় হুকুমের বলে বাড়ী তৈরী করার জন্য দুশো টাকা দাতব্য পেয়েছেন। সবাই বুঝল, শিরোমণির প্রসাদে বাবু-মহাশয়ের গণেশ, কার্ত্তিক, দুর্গা, কালীর দর্শনলাভ আবারও ঘটেছে।

এর পর 'শিরোমণি মশাই' নামেই চক্রবর্ত্তী সুবিখ্যাত হয়ে গেলেন। শিরোমণি মশায়ের গণেশের ধ্যান আমরাও শুনেছি; সেকালের অনেকেই শুনেছেন।

শিরোমণির যজমানী-বৃত্তির পশারও হু-হু ক'রে বেড়ে চলল। তিনি হেলেরই ও কুরীপাড়ায় প্রচার করলেন—"আমি হচ্ছি বাবু-মশায়ের দ্বারপণ্ডিত, সোজা কথা নয়!"

বাবু-মশাই শিলাইদহে এলেই শিরোমণি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। কেউ যদি বলত—"শিরোমণি, কোথায় যাও?" শিরোমণি দ্বার-পণ্ডিতের পদগর্ব্বে উত্তর দিতেন—"জানো না বাপু? রাজদর্শনে যাচ্ছি।"*

* এই রকম অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত প্রজার পাল্লায় অনেকবার পড়েছেন রবীন্দ্রনাথ জমিদারী পরিভ্রমণের সময়ে। শিলাইদহ থেকে লেখা ১৮৯৪ সালের ৬ই জুলাই তারিখের এক পত্রে তিনি এই ধরণের এক ব্রাহ্মণ প্রজার কাহিনী লিখেছেন। সে ব্রাহ্মণটি প্রকাণ্ড একটি সংস্কৃত প্রশস্তি পাঠ করে বলেছিলেন, "আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ আপনার মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করি।" অনেক কষ্টে তিনি ঐ ব্রাহ্মণপণ্ডিত প্রজার হাত থেকে রেহাই পান। (বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৫২ সাল)

পুণ্যাহ-সভা

অনেকদিন আগেকার কথা। তখন রবীন্দ্রনাথ যুবক, জমিদারী দেখাশুনার ভার তাঁর হাতে সবেমাত্র এসেছে। তিনি জমিদারীর সদর পুণ্যাহ উপলক্ষে প্রথম শিলাইদহে এসেছেন।

তখন জমিদারীর সদর কাছারীর পুণ্যাহ-অনুষ্ঠান মহা আড়ম্বরে সম্পন্ন হ'ত। বড় বড় জমিদারের যেমন হয়ে থাকে, এই উপলক্ষে কীর্ত্তন, কবির লড়াই, যাত্রাগান, লাঠিখেলা, কুস্তীর প্রতিযোগিতা, দীন-দরিদ্রদের খাওয়ান, বস্ত্রদান, আমলা ও প্রজাদের প্রীতিভোজ ইত্যাদিতে তিন-চারদিন ধ'রে প্রচুর অর্থব্যয় ও সমারোহ হ'ত। জমিদারবাবু স্বয়ং পুণ্যাহ-সভায় বসতেন। সদর কাছারীর একতলার প্রকাণ্ড হলঘরটি ঐ উপলক্ষে পরিপাটি ক'রে সাজান হ'ত, সিংহ-দরজায় নহবত বসত।

প্রকাণ্ড পাল্কীতে চ'ড়ে জমিদারবাবু মহা সমারোহে পুণ্যাহ-সভায় আসতেই বন্দুকের আওয়াজে, রোশনচৌকীর বাদ্যে, প্রজাদের জয়ধ্বনি আর মেয়েদের হুলুধ্বনিতে ও শঙ্খরবে কাছারী-প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠত। এঁদের পুণ্যাহ-অনুষ্ঠানের একটু বিশেষত্ব আছে, সেইটুকু আগে ব'লে নিই।

জমিদারবাবু পুণ্যাহ-সভায় তাঁর প্রকাণ্ড সুসজ্জিত আসনে

বসলেই কলিকাতার আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য সমাজের প্রথামত প্রথমেই গুরুগম্ভীর স্বরে প্রার্থনা করতেন এবং জমিদারবাবুকে পুষ্পমাল্য ও চন্দনাদি দিয়ে অভিষিক্ত ক'রে আশীর্ব্বাদ করতেন। তারপর হিন্দুশাস্ত্রমতে পূজো হ'ত: স্থানীয় রাজপুরোহিত জমিদারবাবুকে বরণ ক'রে কপালে চন্দনের টিকা পরিয়ে দিতেন। তারপরে জমিদারবাবু সমবেত প্রজা ও আমলাবর্গকে সম্বোধন ক'রে তাঁদের শুভকামনা করতেন। ম্যানেজার তাঁকে পুষ্পমাল্যে অর্চ্চনা ক'রে প্রণাম করতেন, অমনি মাতব্বর প্রজারা ও আমলারা সবাই হাঁটু গেড়ে ব'সে জমিদারবাবুকে সসম্ভ্রমে নজরানা দিতেন। জমিদারবাবু তাঁদের কপালে চন্দন আর গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিতেন। সম্ভ্রান্ত প্রজাদের মধ্যে দু'চারজন দাঁড়িয়ে জমিদারবাবুকে স্তুতি-বাচন ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন।

এর পর রাজপুরোহিত ও গ্রহাচার্য্য মন্ত্র প'ড়ে শুভক্ষণ নির্দ্দেশ ক'রে দিলেই জমিদারবাবু নিজে তাঁদের নূতন কাপড়, চাদর, দধি, মৎস্য ও দক্ষিণা দিতেন। 'পুণ্যাহপাত্র' হিসাবে নির্দ্দিষ্ট সম্ভ্রান্ত প্রজাকে নূতন কাপড়, চাদর, দধি, মৎস্য, তাম্বুলাদি দিয়ে কপালে চন্দন, আর গলায় ফুল ও শোলার মালা দিয়ে অভিষেক করা হ'ত। 'পুণ্যাহপাত্র' সসম্ভ্রমে হাঁটু গেড়ে ব'সে জমিদারবাবুকে নজরানা দিয়ে সকলের প্রথমে 'কর প্রদান' করতেন। তার পরেই প্রজাদের ও নায়েবদের কর-গ্রহণ

আরম্ভ হ'ত। ঢোল, কাঁশি, জয়ঢাক, ব্যাগ্‌পাইপ ক্রমে তাদের বাজনা শুনাত। সেই দিনই বৈকালে দরিদ্রবিদায় হ'ত। পরের দু'তিন দিন ধ'রে ক্রমাগত আমোদ-প্রমোদ ও ভোজ চলত।

পুণ্যাহ-সভায় প্রজাদের সম্ভ্রম ও জাতিবর্ণ হিসাবে বিভিন্ন রকমের আসনের বন্দোবস্ত থাকত। হিন্দুরা এক ধারে, তার মধ্যে ব্রাহ্মণেরা পৃথক্‌ভাবে, মুসলমানেরা অন্য ধারে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পৃথক্ আসনে, সম্ভ্রান্ত প্রজারা আর সদর ও মফস্বল কাছারীর কর্ম্মচারীরাও নিজ নিজ আধিপত্য ও পদমর্য্যাদা রক্ষা ক'রে পৃথক্ পৃথক্ আসনে বসতেন। আচার্য্য, রাজপুরোহিত, গ্রহাচার্য্য, পুণ্যাহপাত্রদের জন্য পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট আসন থাকত।

সেবারে তরুণ জমিদার রবীন্দ্রনাথ প্রকাণ্ড পাল্কী থেকে নেমে বিরাট সমারোহ আর জয়ধ্বনির মধ্যে সুসজ্জিত পুণ্যাহ-সভায় প্রবেশ ক'রেই আসন গ্রহণ না ক'রে স্তম্ভিত হয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন, তাঁর জন্য নির্দ্দিষ্ট ভেল্‌ভেট্-মোড়া সিংহাসনের কাছেও গেলেন না। দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে চারদিকে চাইতে লাগলেন। সভায় যে যার আসনে বসেছে, প্রকাণ্ড হল্‌ঘরখানা বহু লোকের সমাগমে গম্‌গম্ করছে। সকলেই তাঁর বসবার জন্যে অপেক্ষা করছে। কিন্তু কী আশ্চর্য্য, কয়েক মিনিট চ'লে গেল, তরুণ জমিদারবাবু সভায় না ব'সে চুপ ক'রে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন!

সবাই অবাক হয়ে গেল, হৈ-চৈ প'ড়ে গেল। অদ্ভুত ব্যাপার। ম্যানেজার ও আমলাবাবুরা মহাচিন্তিত এবং ভীত হয়ে পড়লেন।—কি ত্রুটি হয়ে গেল, কি অপরাধ হয়ে গেল, কি জন্যে তরুণ জমিদারবাবু রুষ্ট হলেন,—কিছুই ঠিক করতে না পেরে সদর নায়েব মহাশয় (তখন ম্যানেজারকে সদর নায়েব বলা হ'ত) রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে এসে হাত জোড় ক'রে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন।

রবীন্দ্রনাথ এইবারে পুণ্যাহ-সভা থেকে মুখ ফিরিয়ে সদর নায়েব মশাইকে বললেন—"নায়েব মশাই, ব্যাপার কি? পুণ্যাহ-সভায় এমনি হরেক রকম বসবার ব্যবস্থা কেন? মানুষের বসবার জন্য এত বিভিন্ন রকম আয়োজন কেন?"

অবাক হয়ে সদর নায়েব বললেন—"এখানে পুণ্যাহ-আয়োজনে এই রকম ব্যবস্থাই ত চিরকাল চ'লে আসছে। মহর্ষিদেবের আমল থেকে এই রকম প্রথাই চ'লে আসছে যে, আপনার জমিদারীর নায়েব, সদর ও মফস্বলের কর্ম্মচারী, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, শূদ্র, চাষী, সদ্‌গোপ, চাঁড়াল—বিভিন্ন জাতির জন্য, সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ প্রজা, মুসলমান প্রজা—এদের জাতি ও পদ-মর্য্যাদা হিসাবে বসবার ব্যবস্থা থাকবে। এই হচ্ছে এখানকার সভায় বসবার চিরপ্রচলিত প্রথা, নূতন কিছুই করা হয় নি।"

রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে বললেন—"এমন একটা শুভ উৎসবেও আমাদের মিলনে এত বাধা, এত ভেদবুদ্ধি থাকবে

কেন? দেখুন, আমার অনুরোধ, এই সব আসন উঠিয়ে দিন্। আজকের দিনে এই উৎসবে আমরা সবাই একাসনে বসব।—সেইটাই হবে আজকের এই শুভ উৎসবের সার্থকতা।"

সদর নায়েব খুবই আশ্চর্য্য হলেন। এত বড় সম্ভ্রান্ত অভিজাত তরুণ যুবক নিজের জমিদারীতে এসে যে এই রকম প্রস্তাব করতে পারেন, একথা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। কিন্তু তাঁকে তো জমিদারী চাল বজায় রেখে চলতে হবে, বিশেষতঃ স্বয়ং জমিদারের উপস্থিতিতে সে সম্ভ্রম সাড়ে ষোল আনা বজায় রাখতেই হবে। তাই তিনি একটু জোরের সঙ্গেই বললেন—"এটা হচ্ছে জমিদারের একটা বিশিষ্ট আনুষ্ঠানিক দরবার। এখানে উচ্চ নীচ, মানী-অমানী, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, মুসলমান একসঙ্গে বসবে কেমন ক'রে? এই প্রাচীন রীতি তো বদলাবার কোনও উপায় নেই।"

রবীন্দ্রনাথ তখন বললেন—"না না, তা হতেই পারে না। এটা আমাদের সকলের মিলন-সভা, এটা জমিদারী দরবার নয়। আমি বলছি, এসব আসন তুলে নিন্।"

সদর নায়েব এসব কথাগুলো তরুণ জমিদারের ভাবাবেগ মনে ক'রে বললেন—"প্রিন্সের* আমলে, মহর্ষিদেবের আমলে

* রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথকে ইউরোপের সম্ভ্রান্ত সমাজ 'Prince' ব'লেই ডাকতেন। তাই এদেশেও লোকে তাঁকে প্রিন্স দ্বারকানাথ বলত।

যা হয় নি—আমি এত বয়স অবধি নায়েবী ক'রে যা দেখি নি কখনো, তা তো হতে পারে না।”

পুণ্যাহের শুভক্ষণ প্রায় এসে পড়েছে। এমন সময়ে এ কী অভাবনীয় কাণ্ড! প্রজারা, জোদ্দারেরা সবাই একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। আমলাবাবুরা অতিমাত্র ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সদর নায়েব পুনরায় রবীন্দ্রনাথকে আসন গ্রহণ করতে বিনীতভাবে অনুরোধ করলেন। কিন্তু কিছুতেই রবীন্দ্রনাথ সে অনুরোধ রক্ষা করলেন না। তিনি স্থিরকণ্ঠে বললেন—“না, আমি বসব না—কিছুতেই বসব না। এমন একটা উৎসবে কখনই এত বড় বিভেদ সৃষ্টি হতে দেব না। সাধারণ প্রজারা কি আজ অপমানিত হবার জন্যই এই শুভ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছে? আপনি এসব সরিয়ে নিন্, সব একাসন ক'রে দিন্।”

সদর নায়েব তবু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এতদিনকার প্রাচীন প্রথা,—জমিদারী-সম্ভ্রম আজ একেবারে একদিনে নষ্ট হয়ে যাবে?

রবীন্দ্রনাথ এবারে কিছু উগ্রমূর্ত্তি হয়েই বললেন—“এ কখনো হতে পারবে না, সবার একাসন ক'রে দিন্,—এই আমার হুকুম।”

সদর নায়েব নিরুপায় হয়ে স'রে গেলেন। ভাবলেন একটু পরেই তরুণ জমিদারের ভাববিলাসিতা কেটে যাবে। বহু

প্রজা, জোদ্দার, তরুণ জমিদার রবীন্দ্রনাথের অপরূপ রূপ আর মুখের মিষ্টি কথা শুনবার জন্য সেবারে নানা স্থান থেকে এসেছিলেন। তাঁরা ভিড় ক'রে গোলমাল করতে লাগলেন। তরুণ জমিদারও যে তাঁর হুকুম তামিল না করিয়ে ছাড়বেন, এরকম ধারণাও কারো ছিল না,—কিন্তু এতদিনকার প্রাচীন প্রথা!

রবীন্দ্রনাথ সদর নায়েবকে পুনরায় ডাকলেন। তিনি এসেই বললেন,—তিনি সেদিনই চাকরীতে ইস্তফা দিতে চান। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য আমলারাও এসে জানালেন যে, তাঁরা ঠাকুর-বাবুর চাকরী ক'রে জাত-মান খোয়াতে রাজী নন্।

এইবারে রবীন্দ্রনাথ যথার্থ নিরুপায় হয়ে পড়লেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে চেঁচিয়ে সমস্ত আমলা ও প্রজাদের সম্বোধন ক'রে বললেন—"আজ এমন একটা উৎসবের দিনেও কি আমরা একত্র মিলিত হবার সুযোগ হারাব? এটা যদি সত্যিই উৎসব-সভা হয়, তবে এখানে এসেও আমরা পরস্পরে ভেদ সৃষ্টি ক'রে আমাদের মধুর সম্পর্কটা নষ্ট ক'রে দেব? না, তা হবে না। তোমরা আমার কথা শোন, সব চেয়ার সরিয়ে নাও। এস আমরা সবাই আজ একাসনে ব'সে আলাপ পরিচয় করি,—উৎসব করি। এস, সব সরিয়ে নাও।"

বিচিত্র ভোজবাজীর মত কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রকাণ্ড হলঘরের চেয়ার, চৌকী ইত্যাদি অপসারিত হ'ল। সমস্ত

হল্‌ঘরে প্রকাণ্ড ফরাস পাতা হ'ল, কেবল জমিদারবাবুর জন্য মধ্যস্থলে জরি ও ভেল্‌ভেটের কাজ করা একটা গালিচা ও তাকিয়া দেওয়া হ'ল।

রবীন্দ্রনাথ সবার আগে গিয়ে বসলেন। তিনি উচ্চহাস্যে হল্‌ঘর মুখরিত ক'রে বললেন—"সদর নায়েব মশাইকে ডাক, তোমরা সবাই এস, সবাই এখানে বস। এস আমরা সবাই পুণ্যাহের উৎসব করি।"

পুণ্যাহের উৎসব সুসম্পন্ন হ'ল। প্রজারা সেদিন কাতারে কাতারে কাছারীতে ভেঙ্গে পড়েছিল। সেদিন ছোট-বড় সমস্ত প্রজা রবীন্দ্রনাথের অপরূপ দেবমূর্ত্তি দেখে আর তাঁর অমৃত-কণ্ঠের বাণী শুনে তৃপ্ত হয়ে বাড়ী ফিরে গেল।

সেইদিন থেকে পুণ্যাহ-সভায় তীব্র জাতিভেদের ব্যবস্থা উঠে গেল। সেইদিন থেকে পুণ্যাহ-সভায় প্রকাণ্ড ফরাস, আর জমিদারবাবুর বসবার জন্য গালিচা ও তাকিয়ার প্রবর্ত্তন হয়েছে।

এই কাহিনীটি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার মশাইকে বলেছিলেন। ১৩৪৮ সালের "প্রবর্ত্তকে" তাঁর লেখা এই কাহিনীটি আছে।

গোলাপফুলের লোভ

আশ্বিনমাসের মায়ের পূজোয় আমাদের জোট বেঁধে ফুল তোলা একটা বড় রকমের আমোদ ছিল। আমোদটা বেশী ক'রে উপভোগ করার জন্যেই সেবারে আমার ঝোঁক চাপল। আমি সঙ্গীদের কাছে প্রস্তাব করলাম যে, এবারে বাবু-মশায়ের কুঠী-বাড়ীর বাগান থেকে গোলাপফুল আনতে হবে,—তা যেমন ক'রেই হোক।

ব্যাপারটা কিন্তু বড় সহজ নয়। অমন প্রকাণ্ড সুন্দর সখের বাগান ; তাতে মালীদের কড়াকড় পাহারা। গোলাপফুল চুরি ক'রেই আনি বা চেয়েই আনি—সে ব্যাপারটা গুরুতর রকমেরই হবে, তাতে আর সন্দেহ নেই কিছুমাত্র।

কিন্তু তবু আমাদের সবারই মত হয়ে গেল। কারণ, অমন সুন্দর বড় বড় গোলাপফুল—গাছ থেকে পট্-পট্ ক'রে তুলে সাজি ভর্তি করা আমাদের কাছে রাজ্যপ্রাপ্তির মতই স্ফূর্ত্তির বিষয় ছিল।

সেই কল্পনায় বিভোর হয়ে আমরা সবাই যুক্তি করলাম যে, অতি প্রত্যূষে সূর্য্য উঠবার আগেই, মালীরা বাগানে আসতে না আসতে ফুল তুলে সাজি ভরতে হবে। বাগানের লোহার দরজা ও প্রাচীর সম্বন্ধে কি উপায় হবে? আমরা

অন্দরের দরজা অর্থাৎ পূবদিকের গেট দিয়ে বাগানে ঢুকব। পূবের গেটটা ছোট, বিশেষ পূজোর ছুটিতে মালীদের মধ্যে বাগান রক্ষার তৎপরতা নিশ্চয়ই কম। আমাদের অসমসাহসিক মতলব আঁটা হয়ে গেল।

তখনকার কুঠী-বাড়ীর কথাটা একটু বলা দরকার। শিলাইদহের সেকালের রবীন্দ্র-ভবনের নাম কুঠী-বাড়ী। তখনকার কুঠী-বাড়ীর চেহারাটা এখনকার মত ছিল না। তখনকার শিলাইদহ কুঠী-বাড়ী একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষবাটিকারই নামান্তর ছিল। কম্পাউণ্ডের প্রকাণ্ড মাঠটি ভর্ত্তি ছিল হরেক রকমের মূল্যবান্ অসংখ্য গোলাপগাছে; আরো অনেক রকম ফুলের গাছও ছিল অবশ্য। কিন্তু ঐ গোলাপফুলই ছিল বাগানের রাণী। আমরা বাল্যকালে সেই সব গোলাপের স্বপ্ন দেখতাম, আর অনেক তদ্বির ক'রে যদি তার ছুটা একটা সংগ্রহ করতে পারতাম, তবে যেন রাজার ধন হাতে পেয়েছি—মনে হ'ত। ঠাকুরবাবুরা সর্ব্বপ্রথমে পদ্মার তীরে নীলকরদের কুঠী কিনে তাতেই বাস করতেন। পদ্মায় সে কুঠী ভেঙ্গে গেলে তাঁদের নূতন বাড়ীর নামও কুঠী-বাড়ীই রয়ে গেল।

সপ্তমী পূজোর দিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে আমরা বড় বড় ঝুড়ি হাতে কুঠী-বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। তখনো বেশ অন্ধকার। কুঠী-বাড়ী পৌঁছতেই ফর্‌সা হয়ে গেল। আমরা অতি সন্তর্পণে কুঠী-বাড়ীর পূর্ব্বদিকে দীঘির ধারে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকিয়ে

দেখলাম,—কাছে কিনারে কেউ নেই—কুঠী-বাড়ী নিস্তব্ধ। আমরা দীঘির ধার দিয়ে অর্জ্জুন, মহুয়া, সেগুন, শিশু, মহানিম ইত্যাদি গাছের তলা দিয়ে যে রাস্তাটা কুঠী-বাড়ীর পূবধারে অন্দরের গেটের কাছে পৌঁছেছে, সেই রাস্তার ধারে চোরের মত চুপি চুপি ভয়ে ভয়ে একটা চাল্‌তা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে বুঝলাম, আমরা এখনো কোন বিপদের মধ্যে পড়ি নি।

আমাদের সাহস বেড়ে গেল, আরো এগিয়ে সফেদাগাছ আর কাশীর পেয়ারাগাছের নীচে গিয়ে দেখি আমাদের সৌভাগ্য-ক্রমে পূবদিকের গেট খোলা। এখন আর আমাদের পায় কে? কারো কোন সাড়াশব্দ নেই। কিন্তু গেটটা খোলা দেখে একটু সন্দেহও হ'ল যে, মালীরা নিশ্চয়ই জেগেছে, কিন্তু এমন অভাবনীয় কাণ্ড যে হবে তা কে জানে? আমরা প্রায় খোলা গেটের কাছে পৌঁছেছি, অমনি বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! আমাদের সাম্‌নেই বাগানের মালী নয়, কোন আমলা নয়, পেয়াদা নয়, কুঠী-বাড়ীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নয়—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ!

পালাবার পথ নেই; বিশেষ বাবু-মশাই নিজে দেখে ফেলেছেন, পালাবার উপায়ও নেই। বাবু-মশায়ের পেছনেই এলেন কুঠী-বাড়ীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং একজন মালী আর একজন বরকন্দাজ।
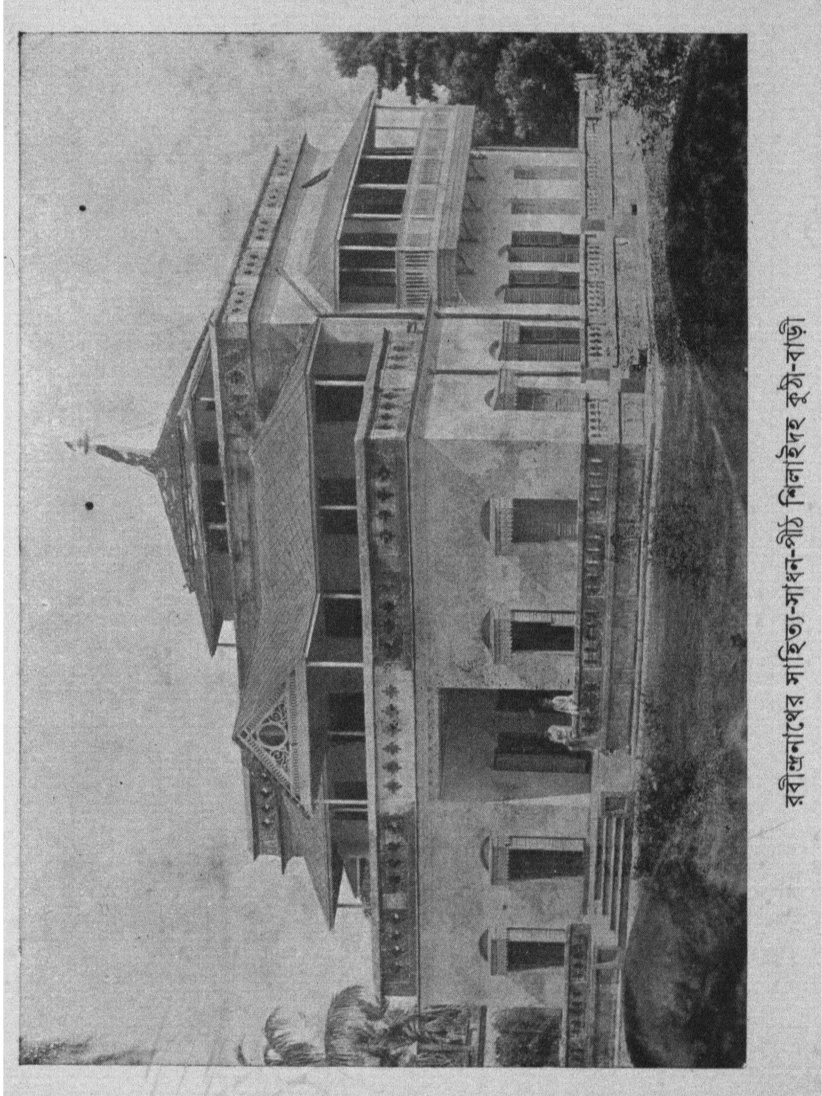
রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধন-পীঠ শিলাইদহ কুঠী-বাড়ী

রবীন্দ্রনাথ তখন যে শিলাইদহে তা আমরা আদৌ জানতাম না, বিশেষতঃ তিনি যে এত ভোরে ঘুম থেকে উঠে বেড়াতে বেরুবেন, তা আমরা কেউ কল্পনাও করি নি।

মালী আমাদের দেখে রেগে আগুন। বাবু-মশাই আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছেন,—আমরা ভয়ে ভাবনায় কেঁদেই ফেলব,—এমন সময় বাবু-মশাই হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে বললেন—"কিহে, পূজোর ফুল তুলতে এতদূর এসেছ? গ্রামের মধ্যে কি ফুল নেই?"

আমরা অপরাধীর মত নির্ব্বাক হয়ে তাঁর পায়ের দিকে নত-নেত্রে চেয়ে রইলাম। তিনি আমাদের ভীত মুখগুলো খানিক দেখে নিয়ে আবার হেসে বললেন—"বাগানের মধ্যে গিয়ে ফুল তুলবে?"

অমনি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অনঙ্গবাবু বললেন—"তোমরা বাগানে ঢুকো না, খবরদার। এক কাজ কর, প্রাচীরের বাইরে ঐ দেখ, কত স্থলপদ্ম, রঙ্গন, জবাফুল ফুটে রয়েছে, গেটটায় অনেক অপরাজিতা ফুটে আছে,—ঐগুলো তোমরা তুলে নাও গে, অনেক ফুল হবে তোমাদের।"

আমরা তাঁর উপদেশ শুনলাম বটে, কিন্তু সেখান থেকে একপাও নড়লাম না, কারণ আমরা তো জানিই প্রাচীরের বাইরে যে অপর্য্যাপ্ত ফুল ফুটে রয়েছে তাতে দুই-তিন ঝুড়ি বোঝাই হয়ে যায়, বিশেষ প্রাচীরের বাইরের ফুলের সংগ্রহে

সেই শরতের ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ভয়ে ভাবনায় ঘেমে উঠব কেন? আমরা একটি কথাও না ব'লে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে একবার বাবু-মশায়ের দিকে একবার বাগানের মধ্যস্থ গোলাপগুলোর দিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইলাম—সেখান থেকে নড়বার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করলাম না। তাঁদের পথরোধ ক'রে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম।

শিশুপ্রিয় রবীন্দ্রনাথ আবার উচ্চহাস্য ক'রে উঠলেন; হেসে বললেন—"ওহে, ওদের গোলাপফুলের লোভ, সে লোভ কি স্থলপদ্মে মেটাতে পারে? তোমরা গোলাপফুল চাও তো? বেশ ত—তোমরা বাগান থেকে তুলে নাও গে, কিন্তু দেখো, যেন গাছটাছ ভেঙ্গো না।" এই ব'লে পরম স্নেহে আমাদের কারো মাথায় হাত দিয়ে, কারো পিঠ চাপড়ে, অপরূপ হাসিতে মুখখানি ভরিয়ে বললেন—"যাও, তোমরা ফুল নাও গে।"

রবীন্দ্রনাথ দীঘির ধার দিয়ে চ'লে গেলেন। মালীর হেফাজতে আমরা সেদিন তো বটেই, পর পর আরো দুই দিন প্রচুর গোলাপফুল তুলে মনের সাধ মিটিয়েছিলাম,—নির্ভয়ে নির্ব্বিবাদে।

স্বপ্ন দিয়ে তৈরী মহাকবির বড় সাধের পবিত্র তপোবন—সেই কুঠী-বাড়ী, কুঠী-বাড়ীর গোলাপবাগান আর নেই, সেই সুখ-স্মৃতিময় বাল্যকালও আমরা হারিয়ে ফেলেছি!

লালা পাগলা

শিলাইদহ থেকে কালোয়া পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে সেইবারেই সেটা নূতন তৈরী হ'ল। রবীন্দ্রনাথ একদিন বিকালে সেই নূতন রাস্তা দেখতে দেখতে কোমরকাঁদির কালীবাড়ীর আর একটা নূতন রাস্তার সংযোগ পর্য্যন্ত এসেছেন, সঙ্গে কয়েকজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী আছেন। এমন সময় এক পাগলা এসে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রে বলল—"হুজুর, সেলাম।"

বাবু-মশাই কথায় কথায় তার দিকে তেমন লক্ষ্য না করায় সে আর একবার সেইভাবে সেলাম ক'রে বলল—"হুজুর, পাগল ব'লে আমার সেলামটা নিলেন না! আমি কি হুজুরের পেরজা নই?"

বাবু-মশাই চমকিত হলেন, বললেন—"বেশ বেশ, তোমার সঙ্গে তো আলাপ হয় নি; চল, তোমার সঙ্গে গল্প করতে করতে যাই।"

লালা পাগলা বাবু-মশায়ের সঙ্গে চলতে চলতে খুব গল্প জুড়ে দিল; ছড়া কেটে বলতে লাগল—"হুজুর, আমি নাকি পাগল, যারা আমায় পাগল বলে তা'রা সব ছাগল।" হিঃ-হিঃ ক'রে হেসে আটখানা হয়ে লালা আবার ছড়া কাটল—

"হুজুর আমি হচ্ছি পাগল,
আমায় দেখে গাঁয়ের লোকের মাথায় ধরে গোল।"

লালা এই রকম ছড়া কাটে আর হো-হো ক'রে হাসে। সঙ্গে সঙ্গে কোমরে জড়ান গামছাখানা বার বার মাথায় বাঁধে আর হাত দুটো কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে মহা স্ফূর্ত্তিতে গল্প করে—"হুজুর, আমি অনেক মজাদার ছড়া জানি, নিরিবিলি পেলে হুজুরকে শুনাব। আমায় যদি ওরা ছড়া কাটতে আর নাচতে নিষেধ না করে, তবে আমি দশ ঝুড়ি মাটি কেটে ঐ রাস্তায় ফেলতে পারি।"

বাবু-মশাই হেসে বললেন—"তোমার ছড়া আমি শুনব। আচ্ছা, কাল তুমি আমার সঙ্গে দেখা ক'রো।"

পরদিন প্রাতঃকালেই লালা পাগলা কোথা থেকে প্রকাণ্ড লম্বা একটা বোম্বাই (গাণ্ডারী) আখ ঘাড়ে ক'রে নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে বাবু-মশায়ের বোটের কাছে এসে হাজির। রবীন্দ্রনাথ তখন বোটের ছাদে ব'সে ছিলেন। লেঠেলরা যেমন ক'রে মাথার উপর লাঠি ঘুরোয়, আখখানা তেমনি ক'রে ঘুরিয়ে বাবু-মশায়কে লম্বা সেলাম ঠুকে লালা আরম্ভ করল—"হুজুর বাহাদুরের সেবার জন্যে কী সুন্দর বোম্বাই কুসুর এনেছি—ভারি মিষ্টি, হুজুর সেবা করবেন।" ব'লেই আখখানা বোটে রেখে তীরে কতকগুলো বালি গাদা ক'রে তার উপর ব'সে বলল—"হুজুর, আমার উপর কী হুকুম হয়?"

যেন কতদিনের পুরানো বন্ধু। বাবু-মশাই বোট থেকে নেমে

তীরে এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে লালার সব পরিচয় জেনে নিলেন। তারপর লালা খুব হেসে নিয়ে

লালা পাগলা

(শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর সৌজন্যে)

নদীতে নেমে হাত-মুখ বেশ ক'রে ধুয়ে গামছা দিয়ে মুছে, সাম্‌নে

এসে রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম ক'রে বলল—"আজ আর আমাকে পাগল বলে কে? আমি লালদাঁদ মাল্‌থে।"

রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন—"তোমার পদ্য শোনাও—"

লালা হাত জোড় ক'রে গামছা গলায় জড়িয়ে ছড়া জুড়ল—

"সত্যি কথা হুজুর,
আমি আপনার মুজুর।
পাকা দাড়ি ধ'রে
মিথ্যে কথা কবো ক্যামন ক'রে?
দয়াল বিনে সবাই যেতাম ম'রে।"

বাবু-মশাই হাসতে হাসতে লালার অনেক ছড়া শুনলেন, গল্প করলেন।

শেষে লালা বলল—"হুজুর, আমার একটা নালিশ আছে। এই দুরন্ত শীত, দেখছেন তো বড় কষ্ট। একখানা কাপড় পেলে গায়ে দিয়ে বাঁচি।" এই ব'লে হিঃ-হিঃ ক'রে হেসে পরিধেয় ময়লা কাপড়খানা দেখাল।

বাবু-মশাই তাকে একখানা র‍্যাগ্ বোট থেকেই দেবার হুকুম দিলেন।

র‍্যাগ্‌খানা পেয়ে লালা আনন্দে আটখানা হয়ে খুব একচোট হেসে নিল। তারপর সেটা একবার গায়ে, মাথায়

* চাষীদের বৈষয়িক অবস্থা ভাল হলে তাদের উপাধি হয়—মালিথা বা 'মাল্‌থে'। ভোজের ব্যবস্থাপককেও মাল্‌থে বলে।

জড়াল, একবার বগলে করল, তারপর সেটাকে ভাঁজ ক'রে বালির ঢিপির উপর রেখে বারবার বাবু-মশায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে লাগল।

বাবু-মশাই গল্পে গল্পে লালার সমস্ত অবস্থাটা বেশ ক'রে জেনে নিয়েছেন যে, বাড়ীর লোকে ওকে মারে, খেতে দেয় না। তাই তিনি বোটের লোকদের হুকুম দিলেন যে, লালা যেদিন বোটের কাছে আসবে সেদিন সে বোটেই খেতে পাবে।

তারপরে লালা প্রায়ই বাবু-মশায়ের বোটে এসে ছড়া কাটত আর পাগলামী করত। বাবু-মশাইও খুব গল্প করতেন আর উপভোগ করতেন। তাঁর কাছে লালা দিব্যি করল যে, সে ম'রে গেলেও আর গাঁজা খাবে না, কিন্তু তামাক খাবে। গাঁজা খাওয়া ছেড়ে দেওয়ায় লালা বছর খানেকের মধ্যে ভাল হয়ে গিয়েছিল।

কি শীত কি গ্রীষ্ম সব সময় লালা বাবু-মশায়ের দেওয়া সেই র‍্যাগ্‌খানা গায়ে জড়িয়ে মহানন্দে গাঁয়ে গাঁয়ে চীৎকার ক'রে বক্তৃতা ক'রে বেড়াত আর সদর্পে সবাইকে ডেকে বলত —"হুঁ হুঁ বাবা! আমি রোজ রোজ বাবু-মশায়ের বাড়ী নেমন্তন্ন খাই। লালা মিঞা সোজা লোক নয়। আমি আগের জন্মে রুমীর বাদশা ছিলাম,—ম'রে মানুষ হয়েছি; এবার ম'রে বাবু-মশায়ের ছেলে হয়ে জন্মাব। ফের আমায় পাগল ব'লে ঘেন্না করলে, ঠাস্‌ ক'রে এক চড়,—হ্যাঁ!"

লালা এই ভাবে অনেকদিন উদ্দামলীলা ক'রে বেড়াল। কিন্তু বাবু-মশায়ের কাছে যখন সে থাকত, তখন খুব কম পাগলামী করত। বাবু-মশাই তার আখ খেয়েছেন শুনে সে এমনই খুশি হয়েছিল যে, একদিন অনেক দূর থেকে সে প্রকাণ্ড দুটা বাতাবী লেবু কাঁধে নিয়ে নাচতে নাচতে বোটে এসে হাজির। তার বাতাবী লেবু না খেলে বাবু-মশায়ের রক্ষা ছিল না। প্রায়ই জিজ্ঞাসা করত—"হুজুর, লেবু খেয়েছিস্ তো? সত্যি খেয়েছিস্? কেমন? মিষ্টি না?"

সে শেষে "আপনি" ছেড়ে "তুই" বলা শুরু করেছিল। বাবু-মশাই তাকে বড় ভালবাসতেন।

লালা পরে ভাল হয়ে গিয়েছিল। তার ছড়া সেকালে গরুর রাখালেরা গাইত; এখন অনেকেই ভুলে গেছে। একটা মাত্র ছড়া এখনো কারো কারো মুখে শোনা যায়—

"আমার দয়াল জমিদার
(হায়) নাই তুলনা তাঁর।
তাঁর মুখখানি হয় চাঁদের নাগাল্
হাত দুটি সোনার।"

নিমাই ঠ্যাঁটা

স্বভাবের দোষে আর স্বচ্ছলতার দেমাকে নিমাই প্রামাণিক গ্রামে সবারই বিশেষ অপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তার উপর দিয়ে বিপদ-আপদের ঝড়ও খুব এক চোট বয়ে গেছে। সুখে থাকতে যে ভূতে কিলোয়, তার অবস্থা দেখেই লোকে বেশ বুঝেছে।

দু'তিনটি দোহাল গরু, লাঙল, বলদ, ত্রিশ-বত্রিশ বিঘে ভাল চাষের জমি, চতুঃশালা ভিটের বাঁধা বাড়ী,—লোকটা বেশ সুখেই ছিল। ক্রমে সে গাঁয়ের 'পেরধানের' পদেও পাকা হয়ে বসত, কিন্তু তার মাথায় মামলাবাজের দুর্ব্বুদ্ধি গজাল, চাষবাসে অবহেলা ক'রে সে হঠাৎ বড়মানুষ হবার দুরাশায় বাঁধাই কারবারে বেশী মাত্রায় মনোযোগ দিল।

জমিদার ঠাকুর-বাবুর সেরেস্তায় সে বছরে প্রায় পঞ্চাশ টাকা মালগুজারী করত। প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুঁটিনাটি নিয়ে নানা রকমের মামলা, তার তদ্বিরাদি, পাটের দালালদের সাথে অনবরত ঝগড়া, বাড়ী-ঘরের কাজ ফেলে থানায় মহকুমায় ঘোরাঘুরি ক'রে তার আর্থিক অবস্থা চার-পাঁচ বছরের মধ্যে হয়ে পড়ল অত্যন্ত শোচনীয়,—গ্রামের লোকের সে হয়ে উঠল মহাশত্রু। কিসে সে জব্দ হবে তার উপায় সবাই ভাবতে লাগল। গ্রামময় তার দুর্নাম রটল 'নিমাই ঠ্যাঁটা' বা 'ব্যাটা

কালনিমে'। কিন্তু মানুষের চেষ্টায় সে জব্দ হ'ল না,—ভগবানই তাকে জব্দ করলেন এবং ভগবানেরই কোন প্রিয়-পাত্র তাকে পুড়িয়ে খাঁটি ক'রে নিয়েছিলেন,—সে কথাটাই বলব।

নিমাইএর অবস্থা ক্রমে এমনই হয়ে দাঁড়াল যে, ঠাকুর-জমিদারের প্রাপ্য খাজনা তামাদি হবার উপক্রম হলেও সে জমিদার সরকারে একটি পয়সাও 'উপুড়-হস্ত' করতে পারল না। আবার কি কারণে যেন ঠাকুর-জমিদারের কৃষি-ব্যাঙ্ক থেকেও তাকে তিনশো টাকা কর্জ্জ করতে হয়েছিল পৈত্রিক বাড়ীখানা বাঁধা দিয়ে। কালনিমের ঘটে দুষ্টবুদ্ধি গজ্‌গজ করত। বাড়ীখানা তার কিছু আগেই নবীন মহাজনের কাছে বাঁধা রেখে দুশো টাকা সে কর্জ্জ করেছিল, কিন্তু ঠাকুর-বাবুর কৃষি-ব্যাঙ্ক সেরেস্তায় কৌশলে সে বিষয়টা গোপন ক'রে বেশী টাকা ধার নিল। সেই তিনশো টাকাও সে এক ফৌজদারী মোকদ্দমায় উড়িয়ে দিয়ে খালি হাতে বাড়ী এসে বসল।

বুড়ো নবীন মহাজন তার কৃষি-ব্যাঙ্কের দেনার কথা জানতে পেরে নালিশ ক'রে বসল এবং ডিক্রীজারীতে নিমাইএর বাড়ী ক্রোকের পরোয়ানা বের ক'রে আনল। সেয়ানে সেয়ানে লড়াই। নবীন মহাজন তাকে সমুচিত শিক্ষা দেবেই। গ্রামের লোক সব মহাজনদা'র পক্ষে—নিমাইএর উপর কারো সহানুভূতি নেই।

এদিকে ঠাকুর-জমিদারপক্ষও তার নামে চার বছরের খাজনার নালিশ এবং কৃষি-ব্যাঙ্কের খতের নালিশ ক'রে ডিক্রী

নিমাই ঠ্যাটা

(শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর সৌজন্যে)

করেছেন, কিন্তু ফন্দি-ফিকির ক'রে নিমাই নানান্ রকমের জবাব দিয়ে আদালতে জমিদারকেও হয়রান করতে ছাড়ে নি।

ঠাকুরবাবুর ম্যানেজার নিমাইএর দেখা পেলে তাকে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করবেন, এই রকম সঙ্গীন অবস্থা দাঁড়াল। নবীন মহাজনের ক্রোকী পরোয়ানার সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুর-বাবুর ক্রোকী পরোয়ানা নিয়ে আদালতের পেয়াদা এসে হাজির। অস্থাবর ক্রোকের জন্যও তার উপর জমিদারের জুলুম কয়েক বার হয়েছে, কিন্তু সে কয়েকটা ব্যাপারেও নিমাই নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও ঠাকুর-জমিদারের আমলাদের হয়রান করেছে খুব।

নিমাইএর তখনকার অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে সঙ্গীন। জগতেব মহাশত্রু নিমাই বুঝতে পারল যে, তাকে রক্ষা করবার শক্তি মানুষের আর নেই, একমাত্র ভগবান যদি তাকে বাঁচান! সে হ'ল কিছুদিনের জন্য নিরুদ্দেশ।

নিমাই নানা স্থানে ঘুরে জানল রবিবাবু-মশাই শিলাইদহে আছেন, আর রাত্রে তাঁর বোট শিলাইদহের অপর পারে চরে নোঙর করা থাকে। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে এসে বাড়ীতে না থেকে প্রায়ই বজরায় বাস করতেন। পদ্মা ছিল তাঁর বিরাট সংসার, আর বজরাখানা ছিল তাঁর নিরালা কুটীর।

অমাবস্যার রাত্রি। চারদিকে ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। আকাশে অসংখ্য তারার ফুল ফুটেছে। পদ্মার তেজও কম নয়। সবেমাত্র তিনি বর্ষার আগমনী গাইতে সুরু করেছেন। নিমাই পদ্মাতীরে ষ্টীমারঘাটের কাছে সেই সন্ধ্যা থেকে ঠায় ব'সে আছে। সে জানে, গভীর রাত্রি ভিন্ন সে বাবু-মশায়ের কাছে

তার প্রাণের দুঃখের বোঝা উজাড় করতে পারবে না। দিনের আলোয় কাছারীর আমলা-পেয়াদা দেখা পেলে নির্ঘাৎ তাকে প্রহার করবে। তাই নিমাই আজ গভীর অমাবস্যার রাত্রে মরিয়া হয়ে দুরন্ত পদ্মায় ঝাঁপ দিল। মৃত্যুকে সে ভয় করে না আজ।

অত গভীর রাত্রেও আলো বোটের জানালা দিয়ে পদ্মার বুকে চিক্‌চিক্ ক'রে শিশুর মত খেলা করছিল। নিমাইএর দেহে আজ মত্ত হস্তীর বল। সে সাঁতরে বোটের পাশে এসে দেখল বাবু-মশাই যেন ধ্যানে নিমগ্ন। তাঁকে সচকিত করবার জন্যে সে বোটের গায়ে পিঠ লাগিয়ে ঠেলে বোটখানাকে বেশী জলে নেবার জন্যে প্রাণপণে ধাক্কা দিল। তার পরিশ্রমের ফল ফলল, কিন্তু সে হাঁপিয়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সচকিত হয়ে কামরার বাইরে এসে দেখেন, এ ত ঝড় নয়! কে যেন সিংহবিক্রমে অতবড় বজরাখানাকে অনেক জলে ঠেলে দিচ্ছে। তিনি চেঁচিয়ে বললেন—"তুমি কে? এ কী করছ? উঠে এস।"

নিমাই বহুকষ্টে আধমরার মত বোট আঁক্‌ড়ে কোন রকমে উপরে উঠে এল। কথা বলবার শক্তি তার নেই।

রবীন্দ্রনাথ বললেন—"তোমার কি প্রাণের ভয় নেই? ভিতরে এস।"

নিমাই বলল—"আমি মরব হুজুর। হুজুরের সাম্‌নেই প্রাণ দেব, নইলে ম'রেও আমি শান্তি পাব না।"

বাবু-মশাই খুব ব্যথিত হলেন তাকে ঐ অবস্থায় দেখে তার চেহারাখানা হয়েছে প্রেতের মত। বললেন—"তোমার এত দুঃখ! এস, ভিতরে এস। সব খুলে বল,—আমি শুনব।"

বোটের কামরায় গিয়ে নিমাই খুব খানিক কেঁদে বাবু-মশায়ের পা জড়িয়ে ধ'রে বলল—"হুজুরের দয়া চাইবার মত মুখও রাখি নি, মরণই আমার বন্ধু, কিন্তু আমি মরলে আমার অনাথা স্ত্রী আর চার-পাঁচটি অপোগণ্ড ম'রে যাবে হুজুর। শুধু সেই হতভাগাদের জন্যে—"

বাবু-মশাই যেন খুবই ব্যথিত হলেন; বললেন—"তুমি নির্ভয়ে বল,—কেন তোমার এ অবস্থা! আমি এখনই সব শুনব।"

নিমাই তার দুঃখের কাহিনী শুনাল।

সব শুনে বাবু-মশাই একটু চিন্তিত হয়েই বললেন—"এত তাড়াতাড়ি কি করা যাবে? তোর অবস্থা খুব সঙ্গীন, আমি বুঝেছি। আজ তুই বাড়ী যা,—আমি তোকে বাঁচাব, তোকে আমি নিজে কথা দিচ্ছি। তুই একবার দোষ করেছিস্ ব'লে, তোকে মেরে ফেলব না,—তোর ভয় নেই।"

নিমাই তবু কাঁদে দেখে বেশ দৃঢ়স্বরে বললেন—"এই আমি বরকন্দাজকে এক্ষুণি ব'লে রাখছি, সে কাল ভোরেই ম্যানেজার-বাবুকে এখানে নিয়ে আসবে। তুইও ঠিক তখন আসিস্।"

বাবু-মশাই তখন নিমাইকে একখানা কাপড় পরতে দিয়ে

রামগতি মাঝিকে হুকুম দিলেন—ম্যানেজারবাবুর নামে লেখা চিঠিখানা সেই রাত্রেই দিয়ে আসতে এবং ডিঙি নৌকা ক'রে তখনই নিমাইকে ওপারে রেখে আসবার জন্যে। ম্যানেজার-বাবু রাত দুটোয় হঠাৎ বাবু-মশায়ের সেই চিঠি পেয়ে অবাক!

পরদিন ভোরে নিমাই পদ্মাতীরে গিয়ে দেখে শিলাইদহের তীরে বোট বাঁধা এবং ম্যানেজারবাবু আগেই এসে বাবু-মশাইকে নিমাই সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখাচ্ছেন। নিমাই বোটের মধ্যে গিয়ে শুনল, ম্যানেজারবাবু একেবারে আগুন ছড়াচ্ছেন—"নিমাইএর অপরাধ অমার্জ্জনীয়—ইত্যাদি। কৃষি-ব্যাঙ্কের দেনা আর বাকী খাজনার দেনা সুদে-আসলে ছ'শো টাকারও উপর তার কাছে পাওনা, হয়রানির তো কথাই নেই,—দেশশুদ্ধ লোক নিমাইএর জ্বালায় অস্থির—"

বাবু-মশাই মনোযোগ দিয়ে ম্যানেজারবাবুর কথা শুনলেন। সব শুনে তিনি বললেন—"এ মানুষটা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। এর এমন পয়সা নেই যে দু'বেলা খায়। চাষের জমিটা খাসদখলে আনলে একে সপরিবারে মেরে ফেলা হবে। এই ভাবেই পল্লীর অশিক্ষিত লোক সব উচ্ছন্ন গেল! এ টাকা আমাদের ছেড়ে দিতে হবে। এ বেচারা পাপের ফল খুব ভুগেছে।"

ম্যানেজারবাবু একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললেন—"জমিটা খাসে না আনলে সরকারের ক্ষতি। বন্দোবস্ত করলেই তা

থেকে অনেক টাকা আসবে। টাকা মাপ দিতে তো আমার অমত নেই।" এই সব ব'লে তিনি ঘোরতর আপত্তি জানালেন।

রবীন্দ্রনাথের সেই এক কথা—"এ বেচারী পাপের ফল হাড়ে হাড়ে ভুগছে—আমি বেশ জানি। সব টাকা মাপ ক'রে দাও—জমিটাও দাও।" নিমাইকে ডেকে বললেন—"শোন্, তোর সব টাকা মাপ ক'রে দিলাম, জমিও ফিরিয়ে দিলাম; কিন্তু বাপু, খাঁটি লক্ষ্মীমন্ত চাষী হতে হবে। আমি আর একবার এসে যেন দেখতে পাই, নিমাইয়ের গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু। চাষে মন দিলেই সব দুষ্টুমী চ'লে যাবে। নইলে আবার সব কেড়ে নেব কিন্তু।"

নিমাই বাবু-মশায়ের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। সে প্রায়ই বলত,—'সে গুষ্টীশুদ্ধ ম'রে কবে ভূত হয়ে যেত। কিন্তু আকাশ থেকে দেবতা এসে তাকে বাঁচিয়েছেন।'

"আমার এই দরিদ্র চাষী প্রজাগুলোকে দেখলে আমার ভারি মায়া করে; এরা যেন বিধাতার শিশুসন্তানের মতো নিরুপায়। তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না দিলে এদের আর গতি নেই। পৃথিবীর স্তন যখন শুকিয়ে যায়, তখন এরা কেবল কাঁদতে জানে,—কোনোমতে একটুখানি ক্ষুধা ভাঙলেই আবার তখনি সমস্ত ভুলে যায়। * * বিধাতা আমাদের এমন একটি ক্ষুদ্র জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড দিয়েছেন, পৃথিবীর একদিক ঢাকতে গিয়ে আর একদিক বেরিয়ে পড়ে,—দারিদ্র্য দূর করতে গেলে ধন চ'লে যায় এবং ধন গেলে সমাজের কতো যে শ্রীসৌন্দর্য্য উন্নতির কারণ চ'লে যায় তার আর সীমা নেই।"—ছিন্নপত্র (শিলাইদহ) পৃঃ ২০০।

ত্রিবেণী মাঝি

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ এসে পরিণত বয়সে পদ্মার উপর বজরায় বাস করতেন। সেই বজরাই ছিল তাঁর বাড়ী ঘর, সব। পদ্মার মত প্রবল নদীর মধ্যে বাস করা খুবই কবিত্বপূর্ণ, কিন্তু সর্ব্বদা বড় নিরাপদ নয়। তাই কয়েকবার তিনি পদ্মা ও মেঘনা নদীতে খুব ঝড়-তুফানের মধ্যে পড়েছিলেন,—একবার কুষ্টিয়ার নিকটে গোরাই নদীতেও বোটে আসবার কালে বিষম বিপদে পড়েন।

সাল আর তারিখটা ঠিক ক'রে বলতে পারব না; একবার তিনি পুত্রকন্যাসহ ঝড়ে বৃষ্টিতে পদ্মার মধ্যে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন, তার কাহিনী অনেকেই ব'লে থাকেন। সেবারে তিনি পদ্মার তুফানে জল-ঝড়ে খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন, কিন্তু একটি মনুষ্য লাভ করেছিলেন এবং সেই মানুষটিকে আজীবন প্রতিপালন করেছিলেন। সেই মানুষটি হচ্ছে—ত্রিবেণী।

সময়টা, নানা জনের নানা বর্ণনার মধ্যে যতদূর জানা যায়, বোধ হয় জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাস হবে। তিনি সন্ধ্যা থেকে আরম্ভ ক'রে প্রায় সমস্ত রাত্রি পুত্রকন্যাদিসহ বোটে শিলাইদহ থেকে অনেক দূরে পদ্মার মধ্য দিয়ে আসতে আসতে প্রবল ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। প্রায় সমস্ত রাত্রি ভিজে পদ্মার

তুফানে বোটে ভাসতে ভাসতে কোন একটি চরে পৌঁছে যেন আশ্রয় পেয়েছিলেন। প্রজারা তাঁর বোটখানাকে তাদের বাড়ীর কাছে বেঁধে রেখে দেয়। পরের দিন অতি প্রত্যূষে তিনি শিলাইদহে আসবার জন্য রওনা হন।

অতি প্রত্যূষে বোট ছেড়ে খানিকদূর আসবার পরেই আবার চারদিক ঘনঘটাচ্ছন্ন হয়ে এল,—ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে পদ্মাও দুরন্ত উদ্দাম নৃত্য সুরু করল। ব্যাপার দেখে মাঝিমাল্লারা অনেক কষ্টে একটা কাঁচি-চরের কাছে বোট লাগিয়ে আকাশ ফর্‌সা হবার আশায় অপেক্ষা করছে। ঝড়ের বেগ অনেকটা ক'মে আসছে—বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে। *

* এই ঘটনাটির উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোন লেখায় করেন নি। তিনি বহু বার পদ্মানদীর মধ্যে প্রবল জলঝড়ে বিপদে পড়েন; নিজে মুখে মুখে সে সব গল্পও করেছেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে শিলাইদহ জমিদারির অন্তর্গত সুবিখ্যাত পাণ্টীহাট পরিদর্শন ক'রে ফিরবার পথে কুষ্টিয়ার নিকট গোরাই ব্রিজে বোটের মাস্তল আঘাত করায় প্রাণসংশয় বিপদে পড়ছিলেন। দীর্ঘকাল বজরায় পদ্মা ও গোরাইএর মত বিশাল তরঙ্গময়ী নদীতে ভ্রমণ ও বাস করবার দরুণ ঐ দুটি ভয়ঙ্করী নদী সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর। 'ছিন্নপত্রে' প্রকাশিত ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসের চিঠিগুলোতে নদীবক্ষে জলঝড়ের চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়। সৃজনশীল কবির মনে পদ্মানদীর নানা লীলা নানা কল্পনার জাল বুনেছিল এবং কাহিনীর খোরাক জুগিয়েছিল। 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পটি (১৮৯৪ খৃঃ, বাং ১৩০১) এবং 'নৌকাডুবী' উপন্যাস (১৯০৪) তাঁর
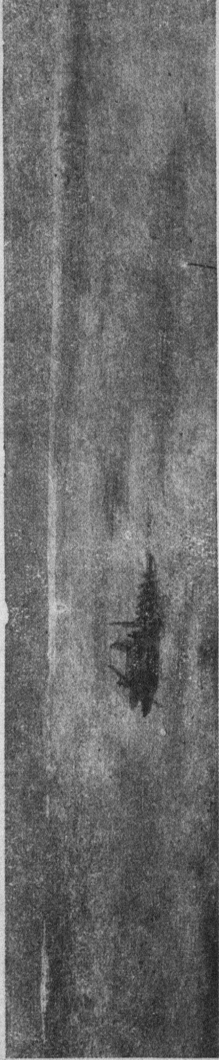
ঝড়ের পরে পদ্মা

(শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর সৌজন্যে)

রবীন্দ্রনাথ বোটের ছাদে এসে ব'সে চারদিকে চেয়ে দেখছিলেন। এমন সময় তাঁর চোখে পড়ল,—যেন একটা মরা মানুষ কতকগুলো ধানগাছের সাথে আটকে আছে। আরো একটু মনোযোগ দেবার পর দেখা গেল, সে লোকটা যেন মাঝে মাঝে হাত-পা নাড়বার চেষ্টা করছে! তিনি তাড়াতাড়ি মাঝিদের বললেন—ঐ লোকটাকে তাঁর বোটের উপর তুলে আনতে।

তখন ঝড়বৃষ্টি থেমে গেছে। রবীন্দ্রনাথের ছেলেমেয়েরা কৌতূহলী হয়ে বোটের পাটাতনে এসেছেন। লোকটাকে বজরায় তোলা হলে দেখা গেল—তখনো তার প্রাণ আছে।

রবীন্দ্রনাথ পাকা চিকিৎসক ছিলেন; বিশেষতঃ হোমিওপ্যাথিতে তাঁর খুবই হাত-যশ ছিল, তা অনেকেই জানেন। তিনি লোকটার প্রাথমিক শুশ্রূষা করলেন, কাপড় ছাড়ালেন, শরীর গরম করালেন,—খানিকটা গরম দুধও খাওয়ালেন। লোকটি সুস্থ হয়ে বসলে দেখা গেল, তার মাথায় টিকি,

পদ্মাজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই রচিত। পদ্মাবক্ষে জলঝড়ের আর একটি কাহিনী আমি "পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথে" 'জলেডোবা বৌ'তে লিখেছি। সে গল্পটি রবীন্দ্রনাথও আমাকে বলেছেন এবং লিখেছেন 'বিশ্বভারতী' কোয়ার্টার্লিতে। 'ত্রিবেণী মাঝি'র ঘটনাটি শিলাইদহের অনেকেই জানেন। পুরোনো প্রজারা এ কাহিনীটি নানা রং ফলিয়ে সবিস্তারে বর্ণনা ক'রে থাকে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দেই এই ঘটনা ঘটেছিল ব'লে অনুমান করি।

কালো পাথরের মত গায়ের রং, বলিষ্ঠ দেহ—বয়সে বালক, জাতিতে পশ্চিমা। সে তার পরিচয় দিল যে, সে পশ্চিমা চৌধুরীদের এক নৌকায় চাকরী করত। মেঘনা নদীতে তাদের নৌকা ঝড়ে ডুবে যাবার মত হয়ে পড়ে। তার পরে তার নাকি কলেরা হয়। অবস্থা খুবই সঙ্গীন দেখে তার মনিবেরা তাকে কোন চরে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে চ'লে যায়। সে আর কিছুই জানে না।

রবীন্দ্রনাথ তাকে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন যে, সে এখন আর কলেরার রোগী নয়, সম্পূর্ণ সুস্থ, তবে খুব দুর্ব্বল। তাকে তিনি ঔষধ দিলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"সংসারে তোর কে আছে? বাড়ী যাবি—না আমার কাছে থাকবি?"

সে এই কথা শুনে যেন হাতে চাঁদ পেয়ে গেল, বলল—তার ত্রিসংসারে কেউ নেই। সে বাবুর কাছেই থাকবে, চাকরী করবে।

বাবু-মশায়ের বোটের হেড্‌মাঝি তপসী তখনো খুব কার্য্যক্ষম; বাবু-মশায়ের বোট ক'খানা ছিল যেন তার বুকের ক'খানা হাড় দিয়ে গড়া। সে বলল—"হুজুর, আমি একে কাজ শেখাব। এ আমার জাত-ভাই, আমারি সঙ্গে থাকবে। আমি আর ক'দিনই বা বাঁচব! আমার লেড়্‌কাও অতি বাচ্চা। একে আমি কাজ শিখিয়ে পাকা মাঝি ক'রে দেব।"

ত্রিবেণী মাঝি কী শ্রদ্ধা—কী ভালবাসার চোখে যে বাবু-মশাইকে দেখেছিল, কী অসাধারণ প্রভুবৎসল ছিল যে, সে রকম এখন আব দেখা যায় না। সে বলত, "বাবু-মশাই আমার জান্—হামি তাঁর পায়েই মরব।"

ত্রিবেণী মাঝি রবীন্দ্রনাথের কোনো একটা কাজ,—কোনো একটা ফরমাইশ না খাটতে পেলে বলত, "আজ আমার অসুখ হবে।" বাবু-মশাইও কোন মাঝিকে ডাকতে হলেই ডাকতেন—"ত্রিবেণী"। বুড়ো তপসী বুঝত যে, বাবু-মশাই এ বেটার মায়ায় পড়েছেন; সে তাতে খুব খুশিই হ'ত। ত্রিবেণীকে সে ছেলের মত ভালবাসত। ত্রিবেণী নিজের নির্দ্দিষ্ট কাজ ক'রেও নিজের হাতে বোট ঝাড়-পোঁছ না করলে তৃপ্ত হ'ত না। বাবু-মশাই অমুক তারিখে 'কল্‌কেতা' ছাড়বেন বা অমুক তারিখে ট্রেনে কুষ্টে পৌঁছবেন,—এই রকমের টেলিগ্রাম এলেই সবার আগে সে খবর নিত, আর হলুদ রঙের ছোপানো পাগড়ী, ফতুয়া, কাপড় প'রে ফিট্‌ফাট হয়ে কাজকর্ম্মে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ত।

তপসী ম'রে গেলে, ত্রিবেণী হ'ল হেড্‌মাঝি; তবু তপসীর ছেলে-বৌ শিলাইদহেই বাস করত,—অনেকদিন মাসহারা পেত এষ্টেট থেকে।

বোটের মাঝি ফুলচাঁদ, তপসী, রামগতি, ত্রিবেণী—এরা ছিল রবীন্দ্রনাথের বেতনভোগী চাকর; কিন্তু এদের কাছে

রবীন্দ্রনাথের কোন কথা জানাতে গেলে এরা এমন সব কথা বলত,—যাতে মনে হ'ত এরা যেন রবীন্দ্রনাথের সন্তান। রবীন্দ্রনাথের 'পদ্মা', 'চিত্রা', 'দুর্গা', 'আত্রাই' বোটগুলো যেন এরা এদের মহামূল্য পৈত্রিক সম্পত্তি ব'লে জ্ঞান করত। রূপকথার সেই 'ময়ূরপঙ্খী নাও'-এর রাজপুত্রকে নিয়ে এই সব কাণ্ডারীরা জলে জলে কত অচিন্ দেশে বেড়িয়েছে, কত অপরূপ রাজকন্যার সন্ধান পেয়েছে—কে জানে!

তা'রাও বোধ হয় অবাক্ হয়ে ভাবত—

"বল, কোন্ ঘাটে ভিঁড়িবে তোমার সোনার তরী!"

মৌলবী সাহেব

শিলাইদহের জমিদারীতে যে বছরে জমিদারবাবুরা দ্বিতীয়-বার খাজনা বৃদ্ধি ক'রে জমাবন্দী করেন, সেবারে প্রথম প্রথম প্রজাদের মধ্যে খুব ব্যাপকভাবে অসন্তোষের আগুন জ্বলেছিল। সেই সময়ে এখানকার গ্রাম্য ইতিহাসে যে কয়জন লোক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, তার মধ্যে এই অদ্ভুত মানুষটি ছিলেন। তাঁর একটি চোখ ছিল কাণা এবং সেই কারণেই বোধ হয় তাঁর বুদ্ধিটি ছিল খুব প্রখর।

শুনা যায়, তিনি নাকি স্থানীয় মুসলমান নয়, তিনি ছিলেন পাঞ্জাবী; আরবী ও পারসী সাহিত্যে সুপণ্ডিত, বড় বড় পারসিক কবিদের বাণী ও কবিতা প্রায়ই আওড়াতেন; সাধারণতঃ উর্দ্দু বা হিন্দীতেই কথা কইতেন। তিনি খুব সুপুরুষ ছিলেন,—আমীর-ওমরাহদের মত দাড়িগোঁফ সমেত

রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'ছিন্নপত্রে' এঁর কথা উল্লেখ করেছেন।—পৃঃ ১০২ এঁর আসল নাম মৌলবী কামালউদ্দিন। গ্রামের লোকেরা এঁকে "কাণা মৌলবী" বলত। ইনি গ্রামবাসী অনেকেরই চক্ষুশূল হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু গ্রামের বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের সঙ্গে এঁর খুব ভাব ছিল। এঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা শিলাইদহেই মারা যান। ইনি তার পর শিলাইদহ পরিত্যাগ ক'রে কোথায় চ'লে যান, কেউ জানে না।

তাঁর সুগৌর দেহকান্তি দেখে সকলেই মুগ্ধ হ'ত। তাঁর চালচলনে বেশ বিলাসিতা ছিল ; মুসলমান সম্প্রদায় তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করত। তাঁর বাড়ীখানি ছিল শিলাইদহে (খোরসেদপুরে, সেকেলে ভাকুণ্ডা), ঠিক পদ্মার ধারে।

মৌলবী সাহেব নিজের দর্শনধারী রূপ, আদবকায়দা আর আরবী-পারসীর পাণ্ডিত্যের জোরেই রবীন্দ্রনাথের খুব পরিচিত

মৌলবী সাহেব

হয়ে পড়লেন। প্রায়ই নানা বিষয় নিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে আসতেন, খুব মিশতেন,—স্থানীয় উন্নতিকর নানা আলোচনায় যোগ দিতেন এবং সব বিষয়েই বেশ উদারতার পরিচয় দিতেন।

এই সব কারণ ছাড়াও তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে বেশী রকম অন্তরঙ্গ হ'লেন এষ্টেটের একজন বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী-রূপে নানাভাবে নিজেকে পরিচয় দিয়ে। তিনি রবীন্দ্রনাথকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তিনি এবারের জমাবন্দী ব্যাপারে প্রজাদের ব্যাপক অসন্তোষ নিবারণে সর্ব্বদাই সাহায্য করতে প্রস্তুত। একজন বিশিষ্ট প্রজা স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে আপোষ ক'রে জমিদারীর কাজে সাহায্য করতে চান,—এই ন্যায়সঙ্গত এবং শোভন প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে সমর্থন করেন। ফলে মৌলবী সাহেব প্রজাসাধারণের সঙ্গে খুব মিশবার সুযোগ পান এবং এতে তাঁর নাম ও ক্ষমতা খুব জাহির হয়ে গেল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাঁর অনেক প্রস্তাব ন্যায়সঙ্গত ব'লে অনুমোদন করতেন। এই সব কারণে আমলাবর্গ ও প্রজাসাধারণ ধারণা করেছিল, মৌলবী সাহেব রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয়পাত্র, অতএব জমিদারীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি।

সেই সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার্থ শিলাইদহে এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসাশালার সৃষ্টি হয় নি। তখন কাছারীর পশ্চিমধারে একটি দাতব্য কবিরাজী চিকিৎসার প্রতিষ্ঠান ছিল। 'খোসাল কবিরাজ'* নামে একজন বিচক্ষণ কবিরাজ ঐ চিকিৎসালয়ের কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন।

---

* খোসালচন্দ্র মজুমদার বিজ্ঞ ও বহুদর্শী কবিরাজ ছিলেন। এঁর দেশ ছিল ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড়ায়। সদালাপী নিরহঙ্কারী

মৌলবী সাহেব নিজের পদমর্য্যাদায় পরিতৃপ্ত এবং সেই মর্য্যাদা জাহির করতে তাঁর খুব আগ্রহ ছিল। তিনি একদিন অনেক রাত্রে তাঁর গৃহিণীর অসুখের জন্য খোসাল কবিরাজ মহাশয়কে ডেকে পাঠালেন শীঘ্র আসবার জন্য। কবিরাজ মশায় সেদিন নিজেই অসুস্থ, অত রাত্রে প্রায় একমাইল হেঁটে রোগী দেখতে যাওয়া তাঁর পক্ষে অসাধ্য। তাই চাকরের কাছে রোগের বিবরণ শুনে তিনি মৌলবী-গৃহিণীর জন্যে বটিকাদি উপদেশসহ পাঠিয়ে দিলেন। কবিরাজ স্বয়ং আসেন নি দেখে মৌলবী সাহেব রেগে আগুন হলেন, কিন্তু ঔষধ খেয়ে তাঁর গৃহিণী ভাল হয়ে গেলেন।

এই ব্যাপারে পদমর্য্যাদা-দৃপ্ত মৌলবী সাহেব কবিরাজ মশায়ের উপর বিষম কুপিত হলেন এবং তাঁকে জব্দ করতে কৃতসঙ্কল্প হলেন।

তার পরদিন একটু বেলা হলে মৌলবী সাহেব স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের বোটে এসে উপস্থিত হলেন।

একথা-সেকথা আলোচনার পর মৌলবী সাহেব বাবু-মশাইকে বুঝাতে লাগলেন—"হুজুর, আপনার জমিদারীর খরচ

পরোপকারী ভদ্রলোক। শিলাইদহ মহর্ষি দাতব্য চিকিৎসালয়ে আধুনিক ভাবে এলোপ্যাথি চিকিৎসা আরম্ভ হলে ইনি কুষ্টে সহরে কবিরাজী করতে থাকেন ও আজীবন ঠাকুর এষ্টেট্ থেকে মাসিক দশটাকা ক'রে পেনসান্ পেতেন।

বড্ড বেশী। এত বেশী আমলা-ফয়লা রেখেছেন যে, কালে আমলাদের মাইনে, পার্ব্বণী দিতে এষ্টেটকে খুব বেগ পেতে হবে। আর কর্ম্মচারী বাড়ানো তো উচিতই হবে না, বরং একটু কার্পণ্য এখন থেকেই করা দরকার।”

রবীন্দ্রনাথ বললেন—“তা তো ঠিক, কিন্তু কাজগুলো তো ঠিকমত হওয়া চাই।”

মৌলবী সাহেব বললেন—“সে তো দরকারই, কিন্তু দেখুন হুজুর, একটা উদাহরণ দিই। দেখুন, আপনি অত টাকা মাইনে দিয়ে এক কবিরাজ রেখেছেন। তিনি মাইনে পাচ্ছেন, ওষুধের দাম পাচ্ছেন এষ্টেট থেকে, তার উপর ফি পাচ্ছেন। অথচ তাঁর প্রত্যহ দুপুরে নাকডাকিয়ে নিদ্রা দেওয়া চাই। কেন? তিনি দুপুরবেলা যদি দু'তিন ঘণ্টা মহাফেজখানার কাজ ক'রে দেন, তবে তো এই গা পোষা আলিস্যিতে লোকটা জাহান্নমে যায় না। এই জমাবন্দীর ব্যাপারে এষ্টেটের পুরানো কাগজপত্র ঘাঁটা তো সোজা ব্যাপার নয়, বিশেষ হুজুরের মহাফেজখানা তো একটা মহাসাগর-বিশেষ, নিজে দেখেছি তো।”

রবীন্দ্রনাথ একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন—“তা আপনি কি করতে বলেন?”

মৌলবী সাহেব একটু হেসে বিজ্ঞ অথচ নিঃস্বার্থ হিতার্থীর মত বললেন—“হুজুর এসব বিষয় আমার চেয়েও বেশী বুঝেন

এবং জানেন। আমার কথা এই যে, আপনি হুকুম দিন্ কবিরাজ মশাই বেলা একটা থেকে তিনটা পর্য্যন্ত মহাফেজখানার কাজ করবেন। তাতে কবিরাজের কাজের ক্ষতি তো হবেই না, বরং লোকটার উপকার করাই হবে, সরকার বাহাদুরেরও একটু কাজ হবে।”

রবীন্দ্রনাথ কথাটা শুনে হাসলেন, মনে মনে মৌলবী সাহেবের জমিদারীর কার্য্যে অযথা হস্তক্ষেপের উৎসাহে ও স্পর্দ্ধায় অসন্তুষ্ট হলেন; কিন্তু এমন একজন শিক্ষিত লোকের মুখের উপর নিজের ন্যায় ও স্পষ্ট অভিমত না জানিয়ে, তাঁকে আর একটু বিশেষভাবে পরীক্ষা করবার জন্য বললেন—“তা দেখা যাবে। আচ্ছা,—আপনি এখন তবে আসুন।”

মৌলবী সাহেব যাবার সময় একটু খুশি হয়ে বললেন—“হুজুর, এটা আমার পক্ষপাতিত্ব নয়, একাজটা আজই করা উচিত। কবিরাজও তো অন্য আমলাদের মত বেতনভোগী কর্ম্মচারী, তিনি শুয়ে-ব'সে মাইনে নেবেন কেন?”

রবীন্দ্রনাথ আবার একটু তীক্ষ্ণস্বরে বললেন—“আচ্ছা সে দেখা যাবে।”

মৌলবী সাহেব হাসিখুশি মুখে বোট থেকে নেমেই সদর কাছারীতে ম্যানেজারবাবুর বৈঠকখানা ঘরে ব'সে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। ম্যানেজারবাবু এলে তাঁকে খুব গম্ভীরভাবে বললেন—“বাবু-মশাই আমাদের কবিরাজ সাহেবের উপর খুব

বিরক্ত হয়েছেন। তিনি বলেছেন, লোকটা আল্‌সের গুরু-মশাই,—তাঁকে প্রত্যহ দু'ঘণ্টা ক'রে মহাফেজখানার কাজ করতে হবে।"

ম্যানেজারবাবু খুব অবাক্ হয়ে বললেন—"হুকুম দিয়েছেন! কৈ? আমি তো সে হুকুম পাই নি!"

মৌলবী সাহেব বললেন—"আজ বিকালেই হুকুম পাবেন। তিনি নিজে এ প্রস্তাব ক'রে আমাকেও একটু জিজ্ঞাসা করলেন। আমি কি বলি বলুন, আমি তাঁর মতেই মত দিলাম।"

ম্যানেজার বাবু বহুদর্শী লোক। তিনি মৌলবী সাহেবকেও চিনে নিয়েছেন। তবু কি জানি, এত বড় ফার্সীর পণ্ডিতকে রবীন্দ্রনাথ একটু বিশেষ চক্ষে দেখেন ব'লে তিনি এই অদ্ভুত হুকুমের অর্থ বুঝতে না পেরে অবাক্ হয়ে ব'সে রইলেন।

মৌলবী সাহেব চ'লে গেলে ম্যানেজারবাবু কবিরাজ মশাইকে ডাকিয়ে তাঁর কোনো কার্য্যে মৌলবী সাহেব অসন্তুষ্ট হয়েছেন কিনা জানতে চাইলেন। কবিরাজ মশাই গত রাত্রের ঘটনা বলতেই ম্যানেজারবাবু এই সম্ভাবিত হুকুমের তাৎপর্য্যটা বুঝতে পারলেন। তিনি আহারান্তেই বাবু-মশায়ের সঙ্গে দেখা ক'রে বিষয়টা জেনে আসবেন ঠিক করলেন। ঠিক সেই সময়ে বোটের বরকন্দাজ এসে তাঁকে খবর দিল যে, বাবু-মশায়ের সঙ্গে তিনি যেন আজই বেলা চারটার সময় দেখা করেন। ম্যানেজারবাবু কিছু প্রকাশ না ক'রে চিন্তিতভাবে বাসায় গেলেন।

এদিকে মৌলবী সাহেব বাড়ী ফিরবার সময় কাছারীতে নিজেই দু-একজন পদস্থ কর্ম্মচারীকে গম্ভীরভাবে জানিয়ে গেলেন যে, কবিরাজ কাল থেকেই প্রত্যহ দু'ঘণ্টা ক'রে মহাফেজখানায় চাকরী করবে, হুকুম হচ্ছে। সবাই শুনে অবাক্,—মৌলবী সাহেবের অসাধারণ প্রতিপত্তি দেখে আমলাবাবুরা থ' মেরে গেলেন।

বেলা চারটায় ম্যানেজারবাবু বাবু-মশায়ের বোটে পৌঁছুলেই লোকচরিত্রাভিজ্ঞ বাবু-মশাই জিজ্ঞাসা করলেন—"কবিরাজ মশায়ের সঙ্গে মৌলবী সাহেবের কোনো মনোমালিন্য হয়েছে কি? কোন খবর রাখো?" ব'লেই তিনি স্থির জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন।

ম্যানেজারবাবু আদ্যোপান্ত সব ঘটনা ব'লে, বললেন—"মৌলবী সাহেব এটা আপনার হুকুম ব'লে কাছারীতে রাষ্ট্র ক'রে গেছেন।"

রবীন্দ্রনাথ বললেন—"মৌলবীর স্পর্দ্ধার মাত্রাটা বেড়ে গেছে—আমি তার সঙ্গে একটু আলাপ করি ব'লে। সে আরো ভেবেছে যে আমি কাঁচা ছেলে,—বুঝি কাব্য-কবিতা ছাড়া আর কিছু বুঝি না।"

ম্যানেজারবাবু হাসতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন লোকের বিচিত্র চরিত্র অধ্যয়নের কৌশল ও অভিজ্ঞতা দেখে অবাক্ হয়ে গেলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তিনি মৌলবী

সাহেবের অযথা এবং অন্যায় স্পর্দ্ধায় যে কতখানি অসন্তুষ্ট তাও তাঁকে ঘুণাক্ষরে বুঝতে দেন নি, ভদ্রতার মুখোস বজায় রেখে মৌলবী সাহেবের মনে একটু আঘাতও দেন নি! তিনি ম্যানেজারবাবুকে ব'লে দিলেন—"লোকটার মনে কোন আঘাত দেবার মত কাজ ক'রো না। তবে সে যেন জমিদারীর কাজে অযথা হাত না দেয়, সেদিকে সাবধান থেকো।"

এর পর মৌলবী সাহেব প্রায়ই এসে দেখতেন—বোটের দরজা বন্ধ। তিনি পাঁচ-ছয় দিন পরে সাধারণ প্রজার মত বাবু-মশায়ের দেখা পেতেন। তিনি বুঝে নিলেন—রবীন্দ্রনাথ তাঁকে চিনে ফেলেছেন।

পলানের মা

শিলাইদহের গয়লাপাড়ার কৈলাস ঘোষের বিধবা স্ত্রী পলানের মা নাম্নী জনৈক গয়লানীর দুধে জল থাকবেই—এই তুচ্ছ সংবাদটা রবীন্দ্রনাথের কানে কি ক'রে উঠল,—তা নিয়ে গ্রামের অনেকে গবেষণা করত। কিন্তু পলানের মা যে কী রকম অসাধারণ কোন্দলপ্রিয়া, তা তিনি টের পেলেন যে কি উপায়ে সেই গল্পই বলব।

সেই সময় রবীন্দ্রনাথের বোট কিছুদিন গয়লাপাড়ার নিকটেই 'হানিফের ঘাটে' বাঁধা থাকত। ফাগুন-চৈত্র মাস। পদ্মা শীর্ণা। বোটের মাঝিরা জটলা পাকিয়ে প্রায়ই বিখ্যাত পাড়াকুঁদুলী পলানের মার লীলা-কাহিনী আলোচনা করত। তা হয়তো সহজ মানুষ রহস্যপ্রিয় রবীন্দ্রনাথের কর্ণগোচর হ'ত। মানুষের অনেক বিচিত্র মানসিক রহস্য তিনি নিজের ভূয়োদর্শনে ও প্রতিভায় দেখেছেন,—সাহিত্যেও সৃষ্টি করেছেন।

একদিন কৌতূহলী রবীন্দ্রনাথ তপসী মাঝিকে বললেন—"হ্যাঁরে, তোদের নামকরা পলানের মাকে দেখাতে পারিস্?"

তপসী বলল—"হ্যাঁ হুজুর, একটু পরেই বোধ হয় পলানের মা ঘাটে আসবে—তখন দেখাব।"

তপসীর কথা মিথ্যা হ'ল না,—একটু পরেই মাথায় চুলের ঝুঁটিবাঁধা, ময়লা কাপড় পরা জনৈক কৃষ্ণাঙ্গী প্রৌঢ়া বিধবা

পদ্মার স্নানের ঘাটে এক রোরুদ্যমান বালককে নিয়ে অবতীর্ণ হ'ল। বালকটি কাঁদছে অবিরাম, আর তার মাকে অবিশ্রান্ত কিল-চড়-ঘুষি মারছে। মা তাকে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে স্নানে চলেছে।

তপসী আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলল—"হুজুর, ঐ যে পলানের মা, আর ঐ ছেলেটি তার পলান।"

কৌতূহলী রবীন্দ্রনাথ সেই অপরূপ দৃশ্য দেখলেন।

পলানের মার একটু ইতিহাস বলা হয়তো অসঙ্গত হবে না। পলানের মার বাড়ীখানি শিলাইদহের সদর রাস্তার একেবারে ধারে। তার গলার স্বর ছিল ভাঙ্গা কাঁসরের মত, চেহারা-খানাও একটু অস্বাভাবিক রকমের ভীমা। সংসারে ঐ হাবাগোবা আট-নয় বছরের পলান ছাড়া তার কেউ ছিল না। তা' ছাড়া, তার এক বিধবা জা ছিল, সে নীলের মা। সে বেচারী পলানের মার মুখের দাপটে তার ছেলেটিকে নিয়ে সদর রাস্তার অপর পারেই তার এক নিকট-আত্মীয়ের বাড়ীতে শান্তিতে বাস করত। পলানের মার চার-পাঁচটি গরু ছিল। সে অনেকেরই দুধের জোগান দিত, বিশেষ ক'রে শিলাইদহ কাছারীর আমলাবাবুদের বাসায়; কিন্তু পলানের মার দুধের বিশেষত্ব এই ছিল যে, তাতে একটু বেশী পরিমাণে জল মেশানো থাকত। এই নিয়ে প্রায়ই গোলমাল, ঝগড়া লোকের গা-সহা হয়ে গিয়েছিল। তার মাথাটাও একটু যেন

কিছু পাগলাটে ধরণের ছিল—কারণ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তার ঝগড়া অতি ভয়ঙ্করভাবে পরিসমাপ্ত হ'ত।

রবীন্দ্রনাথের বোধ হয় পলানের মার সঙ্গে একটু আলাপ-পরিচয় করার ইচ্ছা হয়েছিল। অপ্রত্যাশিত-ভাবে তার একটা সুযোগও মিলে গেল। পলানের মার অনেক জমাজমি ছিল, কিন্তু খাজনা দিতে তার খুব আলস্য, যদিও তার পাওনা-গণ্ডা সাড়ে ষোল আনা আদায় করতে সে খুবই তৎপর ছিল। পলানের মার তিন বছরের খাজনা বাকী। ম্যানেজারবাবু তার বকেয়া খাজনার ড্যামেজ চার্জ্জ ক'রে পেয়াদার পর পেয়াদা পাঠাতে লাগলেন। পলানের মা খাজনা হিসেবে অনেক টাকার দায়ী হয়ে পড়ল,—তার উপরে আবার ড্যামেজ।

সে দরখাস্ত করল—ড্যামেজ মাপের প্রার্থনা ক'রে। সে প্রার্থনা ম্যানেজারবাবু মঞ্জুর করলেন না। পলানের মা ম্যানেজারবাবুর হুকুম শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। আরো যখন সে শুনতে পেল যে, তার অবস্থা বেশ ভাল ব'লেই ম্যানেজারবাবু তার ড্যামেজ মাপ দেন নি, তখন সে বাড়ী ব'সে আপন মনে ঝগড়া সুরু করল—"মুখপোড়া ড্যাক্‌রারা আমায় বড়লোক পেয়েছে! আমি যে না খেয়ে মরি, তা তা'রা চোখে দেখতে পায় না; চোখের মাথা খেয়েছে—" ইত্যাদি।

এর পর দুই-তিন দিন সে পদ্মার স্নানের ঘাটে মহাকলরবে সালঙ্কারে ম্যানেজারবাবু যে অন্যায় ক'রে তার ড্যামেজ মাপ দেন নি, এই নিয়ে গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে তুমুল বকাবকি ক'রে স্নানের ঘাট একেবারে তোলপাড় ক'রে তুলল; উদ্দেশ্য—বোটের মধ্যেই বাবু-মশাই আছেন, যেন তাঁর কানে এই কথাগুলো যায়।

রবীন্দ্রনাথ ব্যাপারখানা বুঝে নিলেন। এক মাঝি চুপি চুপি পলানের মার বাড়ীতে গিয়ে খুব সহানুভূতি দেখিয়ে ব'লে এল, খোদ বাবু-মশায়ের কাছে দরখাস্ত করলে এর প্রতীকার নিশ্চয়ই হবে। এদিকে হঠাৎ বাবু-মশাই ম্যানেজারের কাছে পলানের মার ড্যামেজ মাপের দরখাস্ত তলব করলেন। ম্যানেজারবাবু ভেবে আশ্চর্য্য হলেন যে, এই সামান্য ব্যাপার বাবু-মশায়ের কাছে গেল কি ক'রে!

পরের দিন বাবু-মশায়ের বোটে জমিদারীর কাজকর্ম্ম চলছে—ম্যানেজারবাবু ব'সে আছেন। এমন সময় পলানের মা সশরীরে বোটের মধ্যে গিয়ে টেবিলের উপর তার দরখাস্ত পেশ করল। দরখাস্ত যে লিখে দিয়েছে সে নীচে লিখেছে—"আজ্ঞাধীনা—পলায়নের মাতা—সাং কশবা।"

'পলায়নের মাতা' প'ড়েই বাবু-মশাই হো-হো ক'রে হেসে উঠে বললেন—"তুমি তো এসেছ, তোমার পলায়ন কৈ?"

পলায়নের মা তার স্বাভাবিক কাংস্যকণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়ে বলল

—"হুজুর, সে অনাথ অবোধ বালক, তার কেউ নেই তিনকুলে। সে এত টাকা কোথায় পাবে ?"

বাবু-মশাই হেসে বললেন—"সে দিতে না পারুক, তার মা তো পারবে। সে এত এত দুধ বেচে—দই বেচে। কত টাকা লাভ করে জল বেচে।"

তখন ম্যানেজারবাবু তার অনেক কাহিনী, ঘোষদের অবস্থা ও জমাজমির কথা বললেন।

ম্যানেজারবাবুর কথা শুনে পলানের মা গেল ভীষণ চটে। সে হাত-পা নেড়ে, চোখ দুটো লাল ক'রে ভীষণ বক্তৃতা করল, আবার শেষকালে রৌদ্ররসের পরিবর্ত্তে করুণরস ঢেলে বক্তৃতার পরিসমাপ্তি করল—চোখ দিয়ে খুব জলও ঝরালো।

বাবু-মশাই ব্যথিত হলেন, কিন্তু পলানের মার সুমধুর কোন্দল শুনবার লোভ ছাড়তে পারলেন না। "সময় মত সরকারের টাকা দাও নি কেন ?" এই রকমের এক একটা প্রশ্ন করেন, আর পলানের মার বীভৎস ও করুণরস মিশ্রিত বক্তৃতা শুনে খুব খানিক হাসেন। এমনি ক'রে আধঘণ্টা পলানের মার সঙ্গে মোলাকাৎ ক'রে কৌতুকপ্রিয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর কৌতূহল চরিতার্থ করলেন। পুত্র পলানের নির্ব্বুদ্ধিতা, তারণ ঘোষের হিংসা, নীলের মার অবিবেচনা ইত্যাদি অনেক কাহিনী তিনি উপভোগ করলেন। হাসি গোপন ক'রে বললেন—"যা, তোর দরখাস্ত আমি মঞ্জুর করব না।"

হুকুম শুনবামাত্র পলানের মা রাগে দিগ্‌বিদিক্‌-জ্ঞানশূন্য হয়ে বোট থেকে পদ্মায় ঝাঁপ দিল। বোটের চারদিকে 'ধর্‌ ধর্‌' শব্দ উঠল। বাবু-মশাই ব্যাপার দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। পলানের মা বোটের পাশে সাঁতরায় আর বলে—"বাবু, ড্যামিস্‌ মাপ দিলি না,—এই আমি ডুবে মলাম।"

বাবু-মশাই চেঁচিয়ে বললেন—"মাপ দেব, তুই মরিস্‌ নে, উঠে আয়।"

পলানের মা সাঁতার কাটে আর বলে—"মিথ্যে কথা! আগে বল্‌, মাপ দিয়েছিস্‌। নইলে এই ডুবে মলাম।"

বাবু-মশাই এমন আমোদ কমই উপভোগ করেছেন। শেষে বললেন—"তুই উঠে এসে গ্যাখ, তোর দরখাস্ত মঞ্জুর করেছি।"

তখন পলানের মা জল থেকে ওঠে, হুকুম সত্য কিনা দেখে, তার পর বাড়ী যায়।

পলানের মার কোন্দল-কৌশলে সত্যিই তার দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছিল। এর পরে পলানের মা যদি কখনো বাবু-মশায়ের দেখা পেত, অমনি গলায় আঁচল দিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করত। বাবু-মশাই জিজ্ঞেস করতেন, "তোর পলায়ন ভাল আছে তো?" সে বলত, "হাঁ বাবু, সে হাবাটা হুজুরের আশীর্ব্বাদে ভালই আছে।"

মাধু বিশ্বাস

মাধু বিশ্বাসের চেহারাটা ছিল বৃকোদর ভীমসেনের মত। লোকটা প্রায় একশো বছর বেঁচে ছিল। তার মরবার কয়েক বছর আগে সে বড় তৃপ্তির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটা আশীর্ব্বাদের কাহিনী বলেছিল।

মাধু বিশ্বাস ছিল যৌবনে রোস্তমের মত বীর। সে খুবই গরীব ছিল, কিন্তু বিবাহ করেছিল দুই-তিনটি এবং ছেলে-পিলেও হয়েছিল অনেক। জীবনধারণের জন্য জমিজমার অভাব তার ছিল খুব। সে আর তার দুই-তিনটি ছেলে ছিল ভয়ানক পরিশ্রমী আর শক্তিমান। প্রথম জীবনে মা-লক্ষ্মীর কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়ে মাধু বিশ্বাসের দিন বড়ই কষ্টে কাটছিল।

একদিন একটা লোক মলিন মুখে শুধু হাত দিয়ে চরের বালি খুঁড়ে কাঁকুড় লাগাচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই দিনই এই দরিদ্র উৎসাহী বলিষ্ঠ মাধু বিশ্বাসকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

প্রথম যেদিন সে রবীন্দ্রনাথের কাছে জমির দরবারে এসেছিল, সেই দিনই রবীন্দ্রনাথ তার বীরের মত চেহারা আর অভাব-অভিযোগের বর্ণনায় বড়ই মুগ্ধ ও ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—"মাধু, তোমার যখন টাকা নেই অথচ কম ক'রে পনেরো-কুড়ি বিঘে জমি না হলে তোমার

চলতে পারে না, তখন তুমি অসম্ভব আশা না ক'রে কিছু 'চরচা' জমি নাও।"

'চরচা' জমি বালি-মিশ্রিত জমি এবং তার খাজনা কম;

মাধু বিশ্বাস

নজর দিতে হয় না। এ জমি প্রজারা এক বছরের বেশী ভোগ করতে পারে না।

মাধু বলেছিল—"হুজুর, হাড়ভাঙ্গা খেটেও মরব, আবার ঐ বালির মধ্যে কিছু পাব না।"

রবীন্দ্রনাথ বললেন—"চরচা জমিতে কেউ কেউ ফসল মন্দ পাচ্ছে না তো! তোমরা পরিশ্রমী চাষী, বেশ পরিশ্রম ক'রে চাষ ক'রে প্রথমবারে কাঁকুড়-তরমুজ লাগাও, পরের ছ'মাসে

কলাই দিও। তুমি খুব গরীব। আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি,—এই চরচা জমি থেকেই তুমি দুইবার খুব ভাল ফসল পাবে।”

অভাবগ্রস্ত মাধুর মনে বাবু-মশায়ের আশীর্ব্বাদ বিচিত্র সুরে বেজে উঠল। সে বলল—“হুজুর, আপনার আশীর্ব্বাদে আমি এই বালি থেকেই সোনা ফলাব।”

বাবু-মশাইকে সেলাম ক'রে মাধু আমীনবাবুর কাছে গিয়ে কপাল ঠুকে পঁচিশ বিঘা জমি নিল। বাপ-ব্যাটায় মিলে পরের লাঙল ধ'রে নিয়ে চাষ দিয়ে ঐ সব জমিতে কাঁকুর-তরমুজ লাগাল।

মাস তিনেক পরে মাধু প্রকাণ্ড একটা তরমুজ মাথায় ক'রে বাবু-মশায়ের বোটে হাজির। তরমুজটা এত বড় যে মাধু বিশ্বাসের মত জোয়ানকে সেটা মাথায় ক'রে আনতে হয়েছে!

প্রসন্নহাস্যে বাবু-মশায় বললেন—“কি মাধু, এই কি তোমার চরচা জমির ফসল?”

“আজ্ঞে হুজুর! হুজুরেরই আশীর্ব্বাদ।” এই ব'লে ঐ বিরাট তরমুজটি বোটের উপর তুলে দিল।

বাবু-মশাই বললেন—“ভাল ফসল জন্মিয়েছিস্ মাধু,—এটা একজিবিসনে পাঠিয়ে দে।”

মাধু বললে—“না হুজুর, এটা হুজুরকে সেবা করতে হবে। হুজুরের আশীর্ব্বাদে আমার ক্ষেতে এমন প্রচুর আর

পদ্মার চর
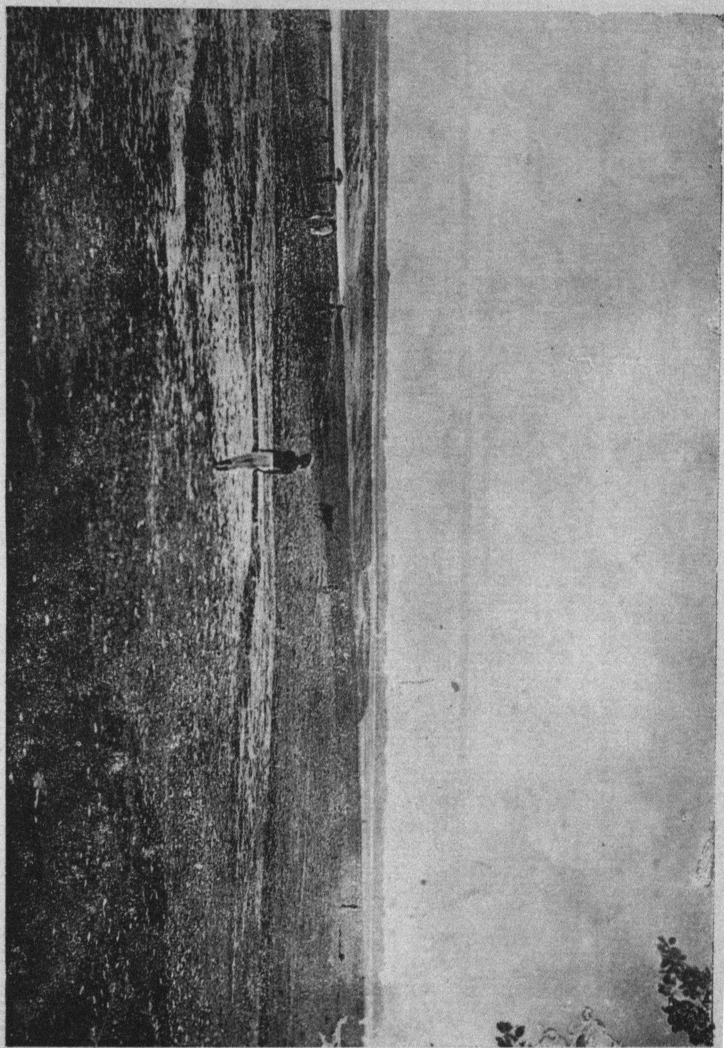
এমন সুন্দর তরমুজ আর কাঁকুড় হয়েছে যে, গোয়ালন্দের চরেও অমন হয় না। কেবল বেচা সুরু ক'রেই পঁচিশ টাকা পেয়েছি। বন্ধু খদ্দের নৌকা নিয়ে আসতে লেগেছে।”

রবীন্দ্রনাথ দশটি টাকা মাধুকে পুরস্কার দিলেন। মাধু টাকা সরিয়ে রেখে বাবু-মশায়ের পায়ে মাথা ঠেকাল; বলল—"হুজুর সাক্ষাৎ ভগবান, ঐ বালিতে এই রকম ফসল পাব তা কেউ ভাবতেও পারে না। এ টাকা আমি নেব না হুজুর।”

রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে মাধু পুরস্কার গ্রহণ করল। তিনি বললেন—"ভ্যাখ্ এবারে জল সরতে সরতে কলাই ছিটাবি। আমি বলছি—খুব ভাল কলাই জন্মাবে। এই টাকায় আসছে বারে কিছু জ্যৈষ্ঠকরের * জমি নিবি, আর পারিস্ তো ছেলে-পুলের জন্য চরে কিছু জমি কায়েমী বন্দোবস্ত নিয়ে রাখিস্।”

মাধু বিশ্বাসের অগাধ বিশ্বাস জন্মে গেল বাবু-মশায়ের আশীর্ব্বাদের উপর। বছরের পর বছর মাধু বিশ্বাসের এমন উন্নতি হ'ল যে, মাধু বিশ্বাস চর অঞ্চলে একজন বিখ্যাত লোক হয়ে উঠল। মাধু বলত, "বাবু-মশায়ের আশীর্ব্বাদ আমি পেয়েছি,—আমি মাটিতে লাঙল ছোঁয়ালেই টাকা উঠবে।”

বাবু-মশাই জমিদারীতে এলেই মাধু একদিন না একদিন তাঁকে দর্শন ক'রে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে আসত। বাবু-মশাই

---

* শিলাইদহের জমিদারীর চর অঞ্চলের খুব ভাল পলি-মাটিযুক্ত উর্বর জমি।

তাকে ঠাট্টা ক'রে বলতেন, "হ্যাঁরে মাধু, আরো বালি চষবি ? তুই আমার চরের সব বালি খুঁড়ে মাটি তুলে ফেলেছিস্ ?" সে বলত, "হুজুরের আশীর্ব্বাদ কোরানের হুকুম—তা কি কখনো ভুল হতে পারে হুজুর ?"

একদিন বাবু-মশাই নিজে হেঁটে গিয়ে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার-পরিবৃত মাধু বিশ্বাসের বাড়ী দেখে এলেন। মাধু কি ক'রে যেন টের পেয়েছিল যে বাবু-মশাই একদিন তার বাড়ীতে নিজে যাবেন। তাই সে পাবনা থেকে একখানা ভাল পালিশ-করা চেয়ার কিনে বাড়ীতে রেখেছিল। বাবু-মশাই তার বাড়ীতে এলে ঐ চেয়ারখানি তাঁকে বসতে দিয়েছিল। বাবু-মশাই হাসতে হাসতে ঐ চেয়ারে বসেছিলেন; মাধুর ক'টা গাই, ক'টা বলদ, ক'টা মোষ, ক'খানা লাঙল—জিজ্ঞেস করেছিলেন। মাধু বলত, "মাধু বিশ্বাসের জন্ম সার্থক।"

পরে মাধু আরো অবস্থাপন্ন হয়েছিল। তার ছেলেরাও এখন বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। খুন্‌খুনে বুড়ো মাধু আমাকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করত, "বাবু-মশাই এখন কোথায় থাকেন ?" আমি বলেছিলাম, "শান্তিনিকেতন—বোলপুরে।" মাধু চিন্তিত মনে বলত, "কোন্ দেশে ? সে বুঝি অনে—ক দূরে ?"

বুড়ো যেন আরো বেশী চিন্তিত হয়ে পড়ত। মাথা নাড়তে নাড়তে খড়ম পায়ে ধীরে ধীরে খট্‌খট্ শব্দ ক'রে বাড়ী ফিরত।

আনারসের মামলা

দুই বুড়ী বোষ্টমীর মধ্যে তুমুল ঝগড়া; শুধু ঝগড়া নয়, ঝগড়া গড়ায় মারামারিতে এবং তার ফলে রক্তপাত। শিলাইদহের পদ্মাতীরে জেলেপাড়ার ছেলে-বুড়ো দুই নারী-যোদ্ধার রণকৌশলে স্তম্ভিত।

শ্রীধর বৈরাগীর বোষ্টমী খঞ্জনি বাজিয়ে বেশ মিষ্টি গান গাইত, আবার কোন্দলে তার সেই মিষ্টি গলা ভৈরব গর্জ্জন করত। তার নাম অনেকেরই সুপরিচিত—'পুণ্যা বোষ্টমী'।* বৃদ্ধা হলেও তাকে বুড়ী বলা যেত না,—তার স্বাস্থ্য দেখে সকলে তাকে হিংসা করত। কালাচাঁদ বৈরাগীর বাড়ীর সীমানা-লাগোয়া ছিল উমা বোষ্টমীর বাড়ী। দুই বাড়ীর মাঝখানে কয়েকটা আমগাছ এবং তার নীচে কয়েকটা আনারসের ঝাড় ছিল।

উমা বোষ্টমী বেশী বৃদ্ধা, একটু ভারিক্কে, তাকে পাড়ার অনেকে 'উমাঠাকরুণ'ও বলত। উমাঠাকরুণই সুন্দর-কান্তি মুরলী বৈরাগীকে বাল্যকাল থেকে পরম স্নেহে নিজের বাড়ীতে পালন করে। মুরলী এককালে খুব ভাল গাইতে পারত, আর খাসা চেহারাখানা ছিল তার।

---

* এই গল্পের পাত্রাদের সম্বন্ধে সেকালের লোকদের কাছে নানারূপ কথা শোনা যায়। সবচেয়ে সত্য কাহিনীটাই বিবৃত হ'ল। ঐ পাড়ায় অনেক বৈরাগী-বোষ্টমী ছিল। অনেকেই তাদের নাম ভুল করেন।

ঝগড়া বাধল এই পুণ্যা বোষ্টমী আর উমা বোষ্টমীর মধ্যে। ঝগড়া ও রক্তপাতের কারণ—আনারস উত্তোলন।

ব্যাপারখানা এই—এই উভয় বোষ্টমীর বাড়ীর সীমানার মধ্যে যে কয়েক ঝাড় আনারসের গাছ ছিল, সেই গাছে পাঁচটি আনারস ছিল। উমাঠাক্‌রুণ একদিন ভোরে সেই আনারসের দুইটি মাত্র তোলে। ঠিক সেই সময়ে পুণ্যা বোষ্টমী সেখানে এসে বলে—"আনারসের সব ঝাড়গুলো আমারই বাড়ীর সীমানায়, উমাঠাক্‌রুণ কেন চোখের মাথা খেয়ে আনারস তুলল ?"

উমাঠাক্‌রুণের বক্তব্য—আনারসের ঝাড় তারই সীমানার মধ্যে, পুণ্যা যে কয়টি চারা ঐ ঝাড়ের কাছে বুনেছিল তা অনেকদিন ম'রে গেছে। অতএব এ সবগুলো ঝাড় তারই এবং আনারসগুলো সে-ই তুলে নেবে।

এই নিয়ে দু'জনে ভীষণ ঝগড়া। পুণ্যা বোষ্টমী তাড়া-তাড়ি ঘর থেকে কাস্তে বার ক'রে এনে বাকী তিনটি আনারস কাটতে উদ্যত হয়। উমাঠাক্‌রুণ তাকে বাধা দেওয়ায় দু'জনে ঝগড়ার পরিবর্তে হুড়াহুড়ি লাগে। বৃদ্ধা উমাঠাক্‌রুণ সুবিধা করতে না পেরে একটা বাঁশের আগা নিয়ে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হয়। কোন্দল এবং আক্রমণ চলতে চলতে পুণ্যা উমাঠাক্‌রুণের পায়ে কাস্তে ফেলে মারে ; তাতে উমাঠাক্‌রুণের পা বেশ একটু কেটে রক্তপাত হয়। উমাঠাক্‌রুণও অবিশ্যি দু'চার ঘা দিয়েছিল।

রক্তপাত হবার পরই দু'জন নিজের নিজের ঘরে গিয়ে মহাচীৎকারে পাড়া একেবারে তোলপাড় ক'রে ফেলল। নিকটেই ছেপাতুল্যার বাড়ী। বেচারী এই কুরুক্ষেত্র কাণ্ডের মধ্যে এসে দু'জনকেই থামাতে চেষ্টা করল; কিন্তু কে কার কথা শোনে? প্রতিবেশী বসন্ত মণ্ডল ছুটে এল—"বলি ব্যাপার কী?"

শেষে ঠিক হ'ল ঠাকুরবাবুর কাছারীতে নালিশ করা হবে, তা হলে এর বিচারও হবে, সীমানার গোলমালেরও মীমাংসা হবে।

পুণ্যা বোষ্টমী অনেকবার রবীন্দ্রনাথকে খঞ্জনি বাজিয়ে গান শুনিয়েছে—'নবনটবর গোরা, তপত-কাঞ্চন-কায়'। তাই সে মহা আস্ফালন ক'রে বলল—"আমি কাছারীতে যাব কেন? আমি খোদ বাবু-মশায়ের কাছেই নালিশ করতে চললাম।"

সত্যই সে গায়ে আরো খানিক ধূলো-কাদা মেখে নিয়ে, ছুটল বাবু-মশায়ের বোটের কাছে। তার পেছু পেছু উমাঠাকুরুণও চলল হাঁফাতে হাঁফাতে। ব্যাপার কি গড়ায় দেখবার জন্য পাড়ার কয়েক জন যুবকও গেল বোটের কাছে।

বাবু-মশাই হেসে বললেন—"তোমরা কি বুয়োর যুদ্ধে গিয়েছিলে? তোমাদের ব্যাপার কি বলো দেখি।"

উভয়েই নিজ নিজ পক্ষ সমর্থন ক'রে নালিশবন্দী হ'ল। উভয়েই বলল—যখন এই কাণ্ডকারখানা ঘটে তখন

সেখানে কেউ সাক্ষী ছিল না, পরে ছেপাতুল্যা আর বসন্ত মণ্ডল আসে, তারপর পাড়া ভেঙে ছেলেবুড়ো আসে মজা দেখতে।

ঐ দুই সাক্ষীর তলব হ'ল। কিন্তু সীমানার সত্য পরিচয় কেউ দিতে পারল না। কে আগে মারে—কি দিয়ে মারে, ইত্যাদির সাক্ষ্য নেওয়া হ'ল। পাঁচটি আনারসও বোটে আনা হ'ল। সেদিনকার বিচার শেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথ হুকুম দিলেন—ঐ জমি যে জোদ্দারের অধীন, সেই জোদ্দার নিতাই রায়কে তলব দেওয়া হোক্।

রবিবাবু হাসতে হাসতে বললেন—"তোমরা আজ যাও। আনারস যেদিন পাকবে, সেই দিন তোমাদের বিচার হবে। তোমাদের আমি তলব দেব,—সেদিন তোমরা দু'জন বাদে আর কেউ বিচারের স্থানে আসতে পারবে না,—তোমরা দু'জনেই মাত্র আসবে আর নিতাই রায় আসবে।"

পাঁচটি আনারস বোঁটায় বোঁটায় দড়ি দিয়ে বোটের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখা হ'ল। যেদিন আনারস ক'টা পেকে হলদে হয়ে মিষ্টি গন্ধ ছড়াতে লাগল, সেদিন নিতাই রায় (তখন ঠাকুর জমিদারের একজন বড় নায়েব ছিলেন) আর দুই বোষ্টমী বোটে হাজির।

নিতাই রায়কে জিজ্ঞাসা ক'রে বাবু-মশাই জেনে নিলেন, কালাচাঁদ বৈরাগী এবং উমাঠাকরুণের বাড়ীর 'দো-সীমানার'

জায়গায় ঐ বিরোধীয় আনারস-ঝাড়গুলো এই কোন্দল ও রক্তপাতের কারণ। উভয় বোষ্টমীই নিতাই রায় মশায়ের প্রজা।

বাবু-মশাই নিতাই রায়কে ব'লে দিলেন—"তুমি আজই এদের উভয়ের জমি মেপে ঐ সীমানায় লাইন ক'রে গোটাকতক জিউলী গাছ পুঁতে দাও গে।"

নিতাই রায় চ'লে গেলে বাবু-মশাই বললেন—"তোমরা কখনো এই আনারস খাও নি। এ আনারস নিশ্চয়ই ভয়ানক তেতো।"

পুণ্যা বলল—"না হুজুর, এমন মিঠে আনারস এদেশে নেই। উমা বোষ্টমীর আনারস গাছগুলো মরো-মরো হলে আমি তারই পাঁচটি চারা ঐ জায়গাতেই পুঁতেছিলাম। আমার গাছেই এগুলো হয়েছিল, আরো চার-পাঁচটা জালি গাছে হচ্ছে। ওর কোন গাছই মুরলীর মার নয়।"

অমনি উমাঠাক্‌রুণ আপত্তি করল—"ধর্ম্মাবতার হুজুর, পুণ্যার পাঁচটা চারাই শুকিয়ে মরো-মরো হয়েছিল। আমার ঝাড়গুলো শুকিয়ে উঠতেই আমি প্রত্যহ তাতে জল ঢেলে তাজা রেখেছিলুম, তা ও চোখ-খাকী দেখেই নি—সেদিন সুপুষ্টু আনারসগুলো দেখে ওর জিভ লক্‌লক্‌ করছিল—তাই নিয়েই এই কাণ্ড।"

রবীন্দ্রনাথ জেরা ক'রে বেশ বুঝে নিলেন ব্যাপারখানা কি ঘটেছিল। তিনি একটু আমোদ উপভোগ করবার জন্য বেশ

গরম হয়ে বললেন—"এমন মিষ্টি খাসা জিনিসের জন্যে তোমরা যে মারামারি কাটাকাটি করেছ, তার জন্যে আমি তোমাদের জরিমানা করব। তোমরা প্রায়ই খুঁটিনাটি নিয়ে দু'জনে ঝগড়া কর, আমি তা বেশ টের পেয়েছি। যাতে ঝগড়া মারামারি বন্ধ হয় সেজন্যে তোমাদের শাস্তি হওয়া উচিত।"

এই কথা শুনবামাত্র ভয়ে দু'জনেরই মুখ শুকিয়ে গেল। উভয়েই হাত জোড় ক'রে বলল—"হুজুর, আমরা আর এজীবনে কেউ কারো সঙ্গে কথা কইব না। আমাদের জরিমানা করবেন না হুজুর।"

রবীন্দ্রনাথ কৃত্রিম রাগে ব'লে উঠলেন—"না, তা কখ্খনো হবে না। তাতে তোমরা কিছুদিন বাদে সাংঘাতিক খুন-খারাবি ক'রে বসবে।...তোমার না এক ছেলে আছে উমা,—তার নাম মুরলী না?"

উত্তর হ'ল—"হাঁ হুজুর।"

রবীন্দ্রনাথ বললেন—"ডাক মুরলীকে।"

ফুট্‌ফুটে কিশোর বালক মুরলী ভয়ে জড়সড় হয়ে বোটের মধ্যে এসে বাবু-মশাইকে প্রণাম করল।

বাবু-মশাই মুরলীকে বললেন—"মুরলী, তুই এখ্খুনি পুণ্যার কাছে গিয়ে তার হাত ধ'রে মাসী ব'লে ডাক্ তো!"

মুরলী ভয়ে লজ্জায় তাই করল। অমনি পুণ্যা বোষ্টমী চেঁচিয়ে ছল-ছল চোখে বলল—"ওরে হারামজাদা, এতদিন

আমায় গাল পেড়েছিস,—তোর মায়ের মারের ভয়ে আমার ঘরে লক্ষ্মীপূজোর ভুজো খেতে আসিস্ নি। তোকে আমি দু'চোখে, দেখতে পারি না—তোর ঐ বুড়ী ডাইনীর জন্যে। আর আজ তুই চোখ দুটো জলে ভাসিয়ে আমায় 'মাসী' ব'লে ডাকলি! তুই পোড়ারমুখোই আজ আমায় জব্দ করলি। আয় হারামজাদা, আয়!" এই ব'লে পুণ্যা বোষ্টমী মুরলীকে বুকের মধ্যে চেপে ধরল। তার চোখ দুটোয় কয়েক ফোঁটা মুক্তাবিন্দু সেই প্রভাতরৌদ্রে ঝলমল করতে লাগল।

বাবু-মশাই হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন—"যা, তোদের মামলা আমি ডিস্‌মিস্ ক'রে দিলাম।...মুরলী, ঐ আনারস ক'টা পেড়ে আন। ওর মধ্যে যেটা কাস্তের কোপওয়ালা, সেটা পুণ্যাকে—তোর মাসীকে দে, বাকীগুলো সব তুই বাড়ী নিয়ে গিয়ে খেয়ে ফেলবি। তোর মাসীকে ভালবাস্‌বি তো?"

মুরলী হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যা বোষ্টমী ও উমা বোষ্টমীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বাবু-মশাই মুরলীকে আবার বললেন—"মুরলী, হুকুম দিচ্ছি,—ঐ জমিতে যতগুলো আনারসের ঝাড় আছে, তুই এখ্‌খুনি গিয়ে সব উপড়ে তুলে ফেলবি, আর গাছগুলো দুই ভাগে ভাগ ক'রে অর্দ্ধেকগুলো তোর মায়ের ঘরের পেছনে আর অর্দ্ধেকগুলো তোর মাসীর ঘরের পেছনে বুনে দিবি, বুঝলি?...আর তোমরা শোন, তোমাদের বাড়ীর সীমানা কালই রায় মশাই ঠিক ক'রে দেবেন।"

আবার হাসতে হাসতে বাবু-মশাই বললেন—"কিন্তু এখনো বিচার শেষ হয় নি—এই মামলার জরিমানা-স্বরূপ, পুণ্যা একখানা গৌরাঙ্গের গান গাও; উমা বোষ্টমী আজ থেকে তোমার বড় বোন হ'ল, কেমন? আমি বিচার ক'রে দিলাম, তোমাদের আর কখ্‌খনো ঝগড়া হবে না। বেশ, একখানা গান শুনিয়ে দাও তো।"

হাসিমুখে পুণ্যা বোষ্টমী মাথাটি দুলিয়ে গ্রীবাভঙ্গী ক'রে মিষ্টিস্বুরে তার জানা সব চেয়ে ভাল গানটি গাইল। তার চোখ দুটি চক্‌-চক্‌ করতে লাগল। গানের সুর পদ্মার তীরে নেচে বেড়াতে লাগল—

"নবনটবর গোরা তপত-কাঞ্চন-কায়
ভাবে অঙ্গ গদগদ—শ্রীনবদ্বীপে উদয়।"

পুণ্যা বোষ্টমী বাড়ী এসে বলেছিল, "জীবনে আমার এই গলায় অত সুন্দর গান আর কখনো গাই নি, বাবু-মশায়ের কাছে যেমনটি গেয়েছিলাম।"

এই মামলার আসামী ফরিয়াদী সবাই হাসতে হাসতে বাড়ী ফিরল।

মুরলী নিজ হাতে আনারস কেটে তার মা ও মাসীকে খাইয়েছিল। তা'রা খেয়ে দেখেছিল—মামলার আনারস ডবল মিষ্টি হয়েছে।

যজ্ঞেশ্বরের সিদ্ধিলাভ

রবীন্দ্রনাথের শ্বশুর মশায় তাঁর স্বগ্রাম থেকে একটি যুবককে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে এনেছিলেন চাকরী-বাকরী দিয়ে প্রতিপালন করবার জন্যে। যুবকটির নাম যজ্ঞেশ্বর। মা সরস্বতীর সঙ্গে বিশেষ পরিচয় না থাকলেও ছেলেটি খুব চটপটে ও সুচতুর।

যজ্ঞেশ্বর জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ীর বিরাট পারিবারিক সমাবেশের মধ্যে এসে মেয়েদের রকমারি ফাইফরমাশ খাটেন; কিন্তু তাঁর ভাগ্যে একটি চাকরী আর হয়ে ওঠে না। তখন ঠাকুরবাবুদের সমস্ত জমিদারীর সদর আফিস ছিল জোড়াসাঁকো ভবনে। সকল জমিদারী থেকেই কর্ম্মচারীরা মাঝে মাঝে নানা কাজের উপলক্ষ্যে সদর আফিসে আসতেন। তাঁদের জাঁকজমক চাল-চলন দেখে যজ্ঞেশ্বরের মনের দুঃখ গুম্‌রিয়ে কেঁদে উঠত—আহা, ওদের মত জমিদারের আমলা হ'ব কবে!

একবার রবীন্দ্রনাথের শ্বশুর মশায়কে যজ্ঞেশ্বর ধ'রে বললেন—"আমার উপায় কি করলেন?" তিনি বললেন—"আচ্ছা, জামাইকে বলব।" কিন্তু তবু আমলাগিরি তাঁর ভাগ্যে জুটল না।

যজ্ঞেশ্বর এবারে রবীন্দ্রনাথের সহধর্ম্মিণী মৃণালিনী দেবীকে তাঁর মনের দুঃখ জানালেন।

"তুমি কি সে কাজ পারবে? জমিদারীর কাজ বড় শক্ত কাজ।" , এই ব'লে তিনি 'বৌমাকে' (৺দ্বিপেন্দ্র ঠাকুরের স্ত্রী) রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করতে লাগিয়ে দিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁদের আবেদনে বললেন—"জমিদারীর কাজ তো সহজ নয়, ও পারবে কেমন ক'রে?"

যজ্ঞেশ্বর রবীন্দ্রনাথের গৃহিণীকে বেশ জোরের সঙ্গে বললেন —"আচ্ছা ফুলিদিদি,* আমি কাজ শিখে নেব—আমি তো নির্বোধ নই।"

রবীন্দ্রনাথ একথা শুনলেন। তারপর গৃহিণী ও বৌমার অনুরোধ-উপরোধে বললেন—"দেখ যজ্ঞেশ্বর, তুমি কেমন কাজের লোক তার একটু পরিচয় নেব। আমার 'সাধনা' পত্রিকার † চাঁদা সাড়ে ছয় হাজার টাকা অনাদায়ী হয়ে প'ড়ে আছে। তুমি তা আদায় ক'রে দাও দেখি! পারবে তো? দেখো, এ কিন্তু মেয়েদের ফরমাশ খাটা নয়।"

যজ্ঞেশ্বর তাঁর কিস্মৎ বুঝাবার জন্য তার পরদিনই খাতাপত্রসহ মহোৎসাহে সেই কাজে লেগে গেলেন। কাজটা রবীন্দ্রনাথ কঠিন ব'লে মনে করেছিলেন, কিন্তু যজ্ঞেশ্বর খুব পরিশ্রম ক'রে দু'মাসের মধ্যে বেশ প্রমাণ ক'রে দিলেন যে, তাঁর পক্ষে একাজ অতি সহজ। তাগিদের একান্ত অভাবেই

---

* রবীন্দ্রনাথের সহধর্ম্মিণী মৃণালিনী দেবীর ঘরোয়া ডাকনাম।

† রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত সুবিখ্যাত 'সাধনা' পত্রিকা।

এতগুলো টাকা আদায় হবে না ব'লে তাঁর ধারণা হয়েছিল। দু'মাসের মধ্যে যজ্ঞেশ্বর নগদ ছ'হাজার টাকার উপর খাজাঞ্চীখানায় জমা দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সামনে হাজির।

রবীন্দ্রনাথ বললেন—"হ্যাঁ, তুমি যে একজন কাজের লোক তার পরিচয় পেলাম।" এই ব'লে দুশো টাকার নোট তাঁকে দিয়ে বললেন—"এ কাজের পারিশ্রমিক আর পুরস্কার তোমার আরো পাওয়া উচিত। কিন্তু এ টাকা ত সব আমার নয়, এতে দেনা শুধতে হবে। এই দুশো টাকা তোমায় দিলাম।"

যজ্ঞেশ্বর বোকা ছেলে নন্, বললেন—"হুজুর, একটা টাকাও আমি চাইনে,—আমি চাই ভাল একটা চাকরী। আমি কি অনুপযুক্ত?"

বাবু-মশাই বললেন—"আচ্ছা, চাকরী তোমায় দেব। কালীগ্রাম পরগণায় রাতোয়াল কাছারীর মুহুরীর কাজে তোমায় বহাল করব,—একটু সবুর কর। আপাতত খাজাঞ্চীখানায় খাতা লেখ। কিন্তু জমিদারীর আমলাগিরি ক'রে সুখ পাবে না যজ্ঞেশ্বর।"

যজ্ঞেশ্বর রবীন্দ্রনাথের শেষ কথাটা বুঝতে না পারলেও বেশী কিছু বলতে সাহস পেলেন না। কিন্তু প্রায় ছ'মাস কলকাতা সদরের খাজাঞ্চীখানায় টাকা আনা কড়াক্রান্তি যোগ-বিয়োগ ক'রেও যখন দেখলেন যে তাঁর বড় সাধের আমলাগিরি মৃগতৃষ্ণিকায় পরিণত, তখন একদিন রবীন্দ্রনাথকে খুব শক্ত

ক'রে ধ'রে বসলেন। রবীন্দ্রনাথ একটু ভেবে বললেন—"আচ্ছা, তুমি আমার সঙ্গে শিলাইদহে চল। রাতোয়াল কাছারীর মুহুরীগিরির চেয়ে শিলাইদহেই তুমি ভাল কাজ পাবে।"

এইখানে শিলাইদহের ঠাকুর কোম্পানীর (Tagore & Co.) কাহিনীটা বলা নিতান্ত দরকার। এই সময় মফঃস্বল জমিদারী থেকে ভুষো মাল আর পাট কিনে বাঁধাই কারবার চালাবার জন্য শিলাইদহে ঠাকুর কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হয়; তার আফিস কুষ্টেতেও ছিল। পরে এই কোম্পানীর প্রধান আফিস কুষ্টে কুঠী-বাড়ীতে (কুষ্টে মোহিনী মিলের নিকটে) উঠে আসে। ঠাকুরবাবুদের কুষ্টে কুঠী-বাড়ীর দোতলার ফটকে সাদা পাথরে এখনো লেখা আছে—'Tagore & Co.' রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথও এই কারবার দেখতেন শুনতেন। এই ঠাকুর কোম্পানীর ইতিহাস এখানে সবটা বললে পুঁথি বেড়ে যাবে। অতএব তার চেষ্টা মুলতবী রইল। তবু তার কতকাংশ এই গল্পের মধ্যে আছে।

রবীন্দ্রনাথের উপদেশমত জমিদারীর তৎকালীন ম্যানেজার অমৃতবাবু যজ্ঞেশ্বরবাবুকে বললেন—"আপনি '—' মৈত্র-মশায়ের অধীনে ঠাকুর কোম্পানীর কাজ করতে আরম্ভ করুন। তবে বিশেষ ক'রে জেনে রাখুন কোম্পানীর অবস্থা ভাল নয়। আপনি একাজে সুদক্ষ হবেন ব'লেই বাবু-মশায়ের বিশ্বাস।

কুষ্টে কুঠী-বাড়ী
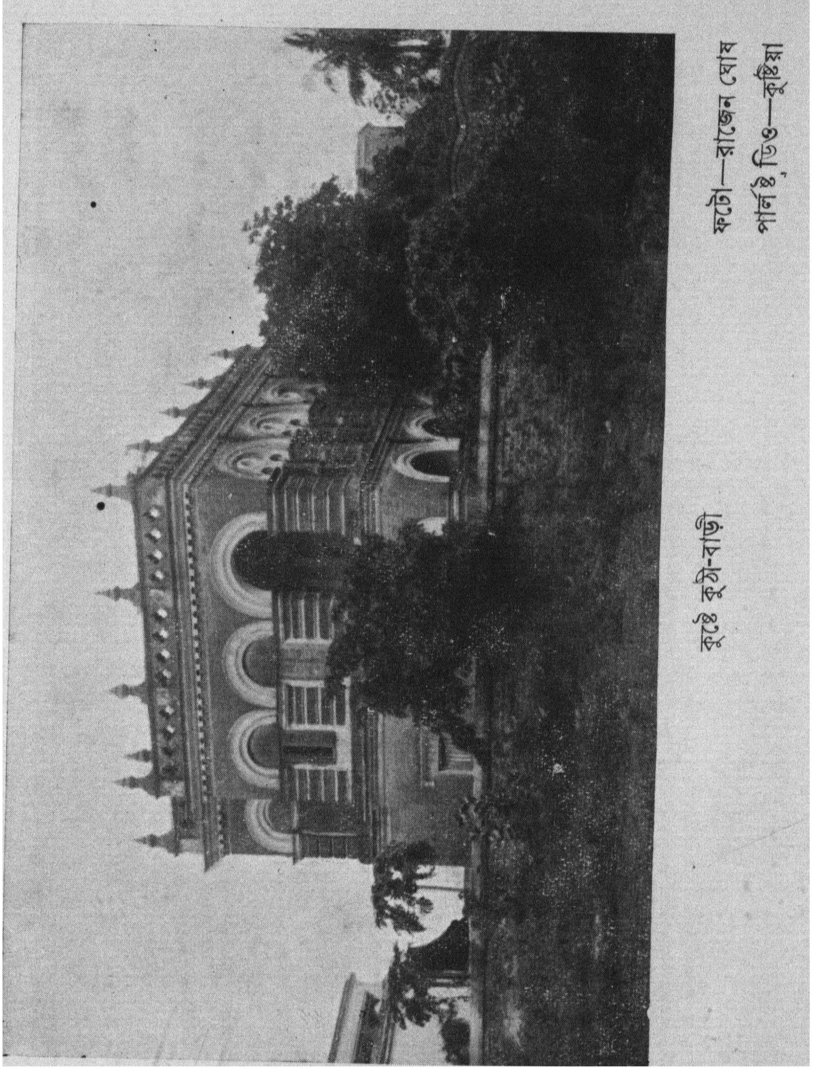
ফটো—রাজেন ঘোষ
পার্লষ্ট ডিও—কুষ্টিয়া

'—' মৈত্র-মশায়ের সঙ্গে থেকে যাতে কোম্পানীটা দাঁড় করাতে পারেন, তার জন্যে চেষ্টা করুন।"

যজ্ঞেশ্বরবাবু কাজে লেগে গেলেন *। তাঁর উপরওয়ালারা বিশেষতঃ মৈত্র-মশাই বেশ বুঝে নিলেন, যজ্ঞেশ্বরবাবু সুচতুর ও শক্ত লোক। বছর তিন-চার কাজকর্ম্ম চলল, কিন্তু উন্নতি তো দূরের কথা, ক্রমশঃই ঠাকুর কোম্পানীর কাজ অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ও জটিল হয়ে উঠল। যদিও প্রথম কয়েক বছর কোম্পানীর লাভ কিছু হয়েছিল, কিন্তু ক্রমশঃ কোম্পানীর পরিণাম এমনই শোচনীয় হতে লাগল যে, এই কোম্পানী স্থাপনের মহৎ উদ্দেশ্য প্রায় ব্যর্থ হবার উপক্রম হয়ে উঠল।

আরো দু'এক বছর গেল। জোড়াসাঁকো সদর আফিস থেকে কোম্পানীর প্রকৃত অবস্থা রিপোর্ট করবার জন্য ক্রমাগত তাগিদ আসতে লাগল। শিলাইদহ থেকে যে রিপোর্ট গেল তাতে যজ্ঞেশ্বরবাবুকে এই কাজের জন্য জবাবদিহি করা হ'ল। যজ্ঞেশ্বরবাবুর উপরওয়ালারা তাঁর সঙ্গে খুব সদ্ভাব দেখিয়ে কাজ চালাচ্ছেন, কিন্তু যে রিপোর্ট লিখে ম্যানেজারবাবু সদরে পেশ করলেন, তাতে যজ্ঞেশ্বরবাবুর অজ্ঞাতে তাঁর বিরুদ্ধে চোখা চোখা বাণ নিক্ষেপের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রইল।

কিছুদিন যায়। যজ্ঞেশ্বরবাবু আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর রাখেন না। কলকাতা সদর আফিস থেকে

* ১৩০২ সাল, আষাঢ় মাস।

যজ্ঞেশ্বরবাবুর বরখাস্তের হুকুম এল এবং মৈত্র-মশায়ের উপর ঠাকুর কোম্পানীর হিসাব-নিকাশ অতি শীঘ্র পেশ করবার হুকুম এসে ব্যাপারটাকে অত্যন্ত ঘোরাল ক'রে তুলল। ঠাকুর কোম্পানীর হিসাবপত্র এমনই জটিল হয়ে উঠেছিল যে, মৈত্র-মশায়ের তার মধ্যে দন্তস্ফুট করবার সাধ্যও ছিল না। তিনি যজ্ঞেশ্বরবাবুকে কুষ্টে থেকে ডাকিয়ে এনে হিসাব-নিকাশ লিখে প'ড়ে ঠিক করতে বললেন।

যজ্ঞেশ্বরবাবু এসেই শুনলেন তাঁর চাকরীর জবাব হয়েছে। কোম্পানীর মুহুরীমাত্র হয়ে কি গাফিলতি হ'ল এবং কি অপরাধে চাকরী গেল তিনি তার কিছুই বুঝতে না পেরে বিষম বিব্রত হয়ে পড়লেন।

এমনি অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে বলেন্দ্রনাথের সঙ্গে শিলাইদহে এলেন। যজ্ঞেশ্বরবাবু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মুখ থেকে তাঁর অপরাধের বিষয়টা জানবার জন্য শিলাইদহ কুঠী-বাড়ীতে গিয়ে দেখলেন রবীন্দ্রনাথ গ্রামের মধ্যে বেড়াতে বেরিয়েছেন। তিনি সোজা দোতলায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সহধর্ম্মিণীর দেখা পেয়ে নিজের কথা সব বললেন।

সব শুনে জমিদার-গৃহিণী অত্যন্ত দুঃখের সহিত বললেন—"যজ্ঞেশ্বর, তোমার এখানে চাকরী ক'রে কাজ নেই। এত গোলমাল যেখানে, সেখানে আমি তোমায় কাজ করতে দেব না।"

ঠিক এমনি সময়ে রবিবাবু সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন—"যজ্ঞেশ্বর, কোম্পানীকে একেবারেই পদ্মার জলে ডুবিয়ে দিলে? এতগুলো টাকা একেবারে উড়ে গেল, অথচ তোমরা কেউ জানতে পারলে না! আবার আরো টাকা চাই ব'লে মৈত্র-মশাই রিপোর্ট করেছে। তোমাকে ত খুব হুঁসিয়ার লোক ব'লেই জানতাম।"

কবিগৃহিণী অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে অভিমানের সুরে বললেন —"যজ্ঞেশ্বরের জন্যেই তো তোমার কোম্পানী ফেল হ'ল! আমি আগেই জানি, আমার দেশের লোক ব'লেই তার অপরাধ। তার অপরাধের আর বিচার ক'রে কাজ নেই। তাকে জবাব দিয়েছ, বেশ করেছ। ও আর তোমাদের কাজ করবে না।"

রবীন্দ্রনাথ বললেন—"কী আর করব বল,—ওর উপর-ওয়ালার রিপোর্ট ত আমায় শুনতে হবে। আচ্ছা, যজ্ঞেশ্বর, আমি ব্যাপারটা ভাল ক'রে বুঝতে চাই। চল ত আফিস-ঘরে, আমায় আসল ব্যাপারটা বুঝিয়ে দাও দেখি।"

যজ্ঞেশ্বরবাবু একটা মোটামুটি হিসাব সঙ্গে এনেছিলেন। সে সব তিনি দেখালেন এবং বুঝিয়ে দিলেন যে, যাঁরা কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ তাঁদের বহু প্রকারের গাফিলতির দরুণ মাল আদৌ কাটতি হচ্ছে না। ভুষো মালের দর ক্রমশঃ সব মহালেই চড়েছে, তবু কোম্পানী ফেল হয়েছে এ রকম ধারণা বদ্ধমূল হবার কারণ এখনো ঘটে নি।

রবীন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ ব্যাপারটা নিয়ে কিছুক্ষণ মাথা ঘামালেন। শেষে বলেন্দ্রনাথ বললেন—"মজুত মাল বিক্রী না করলে ঘর থেকে আর কত টাকা দেওয়া যায়? বাজার যাচাই ক'রে বিক্রী করলে কি লোকসান হবে মনে কর?"

বলেন্দ্রনাথকে যজ্ঞেশ্বরবাবু বুঝিয়ে দিলেন, আরো ছ'টি মাস দেরী না ক'রে মাল বেচলে খরিদা দরেই বেচতে হবে।

আলোচনা চলতে লাগল। বলেন্দ্রনাথ বললেন—"আচ্ছা, ছ' মাস দেরী না হয় করা গেল। কিন্তু বাজার যাচাই ক'রে বিক্রী কে করবে? কিছু লাভ হবার আশা কোথায়? বিক্রী করবার দায়িত্ব তুমি নেবে?"

যজ্ঞেশ্বরবাবু বললেন—"আমি সামান্য মুহুরী মাত্র, তবু আমি সে ভার নিতে রাজী আছি, তবে মৈত্র-মশায়ের উপর সেই রকম হুকুম দিতে হবে।"

চিন্তিত রবীন্দ্রনাথ এইবারে কথা বললেন—"বেশ, আমি সেই রকম হুকুমই দিয়ে যাব। কিন্তু মৈত্র আরো টাকা চায় কেন? এখন আরো মাল কি কেনা উচিত?"

যজ্ঞেশ্বরবাবু বুদ্ধিমান্। তিনি বললেন—"তা জানবার তো আমার কোন অধিকার নেই হুজুর, তবে এ বাজারে মাল কিনলে টাকাটা বহুদিন ধ'রে আটকা প'ড়ে থাকবে।"

শেষে অনেক আলোচনার পর ভুষো মালের কারবার ছেড়ে দিয়ে, পাট বেশী পরিমাণ কেনাই সাব্যস্ত হয়ে গেল। এর

ফলেই পাটের কারবারের উপর খুব বেশী জোর দেওয়া হ'ল—প্রচুর পাট কেনা আরম্ভ হ'ল। এতে তাঁরই ঝোঁক ছিল বেশী।

এই আলোচনার দুই দিন পরেই রবীন্দ্রনাথ কি যেন ভেবে একটা কাগজে লিখে হুকুম দিলেন—"যজ্ঞেশ্বর, তুমি মজুত মাল এখনই সব বেচে দাও, যেন ক্ষতি না হয়। আমি পাবনা যাচ্ছি, এসেই দেখতে চাই যে, মালগুলোর অন্ততঃ খরিদ দাম তুমি জমা দিয়েছ।"

যজ্ঞেশ্বরবাবু হঠাৎ এই অপ্রত্যাশিত হুকুমের প্রতিবাদ করবারও সময় পেলেন না। তার পরদিনই তিনি গুদামের সমস্ত মাল বস্তাবন্দী ক'রে পাঁচ-ছ'খানা বড় পান্সী বোঝাই ক'রে কুষ্টে চ'লে এলেন। অনেক খোঁজ-খবর নিয়ে কয়েক দিনের মধ্যেই কুষ্টের মাড়োয়ারীদের ঘরে সমস্ত মাল বেচে নগদ নয় হাজার টাকা বাক্সবন্দী ক'রে ষ্টীমারে চেপে সন্ধ্যায় যজ্ঞেশ্বরবাবু শিলাইদহে ফিরে এলেন। এসেই দেখেন পরিশ্রান্ত রবীন্দ্রনাথ সেই দিনই শিলাইদহে পৌঁছেছেন। *

পরদিন প্রভাতেই বাক্সবন্দী টাকাসহ যজ্ঞেশ্বরবাবু কুঠী-

---

* এই সময়টা রবীন্দ্রনাথের কর্ম্মজীবনের একটি বিখ্যাত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এরই কিছু আগে শিলাইদহে ও কুষ্টে কুঠী-বাড়ীতে এবং শিলাইদহ কাছারীপ্রাঙ্গণে তিনি তিনটি প্রকাণ্ড তাঁতশালা প্রতিষ্ঠা করেন ও জমিদারীর কাজের আমূল সংস্কার করেন। তিনি জমিদারীর মধ্যে স্বদেশী আন্দোলন সুরু করেন।

বাড়ীতে বাবু-মশায়ের সামনে এসে বললেন—"নয় হাজার টাকা এনেছি। সেদিন মজুত মালের সর্ব্বোচ্চ খরিদ মূল্যের যে হিসাব দেখিয়েছি, তার দেড়গুণ টাকা পেয়েছি। ছ'মাস অপেক্ষা করলে এর অন্ততঃ ডবল পাওয়া যেত।"

ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত রবীন্দ্রনাথ একটু খুশি হয়েছেন ব'লে মনে হ'ল ; তিনি তবু গম্ভীর হয়ে বললেন—"তুমি এ কারবারের ম্যানেজারী নিতে পার ?"

যজ্ঞেশ্বরবাবু বললেন—"হুজুর, ব্যবসা চালানো বড় দায়িত্ব-পূর্ণ। এতে আমার বুদ্ধিবিবেচনা কর্ত্তৃপক্ষের পছন্দ হবে না ব'লেই বিশ্বাস। তার চেয়ে দয়া ক'রে জমিদারীর মধ্যে আমায় একটি চাকরী দিন্।"

রবীন্দ্রনাথ হাসলেন। গম্ভীর হয়ে টাকাটা খাজাঞ্চীখানায় জমা দিতে ব'লে উপরে উঠে গেলেন।

যজ্ঞেশ্বরবাবু সেই দিনই দুপুরে জানতে পারলেন কোম্পানীর শিলাইদহের শাখা আফিসের ভার তাঁকে দেওয়া হয়েছে। কুষ্টে আফিসের সমস্ত ভার মৈত্র-মশায়ের উপর দেবার হুকুম হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় চ'লে গেলেন। ইতিমধ্যে আখ মাড়াইএর কলের ব্যবসাও ঠাকুর কোম্পানীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কাঠ, লোহা ইত্যাদি কেনা হয়েছে। কুষ্টেতে আখ মাড়াইএর কল তৈরীর সূত্রপাত এইখানেই। তখন রেন্‌উইক কোম্পানী ব্যাপকভাবে একাজে হাত দেয় নি। কাজটা লাভজনকই ছিল,

কিন্তু অব্যবসায়ী কর্ম্মচারীদের হাতে প'ড়ে বহু অর্থ ব্যয় ক'রেও ঠাকুর কোম্পানী লাভের অঙ্ক দেখতে পেল না।

কিছুদিন পরে এমন কতকগুলো ব্যাপার ঘটে' গেল যাতে ব্যবসায়বুদ্ধিহীন কর্ম্মচারীরা যজ্ঞেশ্বরের উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠলেন, কিন্তু যজ্ঞেশ্বরবাবুর কৌশলে কোম্পানীকে আর দেনা করতে হ'ল না। শুধু তাই নয়, একখানা হুণ্ডী-ভাঙ্গানোর ব্যাপারে যজ্ঞেশ্বরবাবুর কৃতিত্বের কথা রবীন্দ্রনাথের কর্ণগোচর হ'ল। কিন্তু তবু মোটের উপর কোম্পানীর ক্রম-বর্দ্ধমান ক্ষতি চলতেই লাগল। শেষে শিলাইদহ ঠাকুর কোম্পানীর পরিণাম রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ষ্টীমার কোম্পানীরই ক্ষুদ্র সংস্করণ হয়ে দাঁড়াল। *

হঠাৎ টেলিগ্রাম এল যে রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ কুষ্টে আসছেন। যজ্ঞেশ্বরবাবু বেশ বুঝতে পারলেন, এইবারে আমলাতন্ত্রের অনেক কিছু সংস্কার হবে এবং ঠাকুর কোম্পানীরও একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। তিনি কুষ্টে এলেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁকে ডেকে গোপনে বললেন—"যজ্ঞেশ্বর, রবিকাকা তোমায় যা বলবেন তুমি তাতে রাজী হ'য়ো। ঠাকুর

* রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতিতে' এই কোম্পানীর কতকটা পরিচয় পাওয়া যাবে। এই ব্যবসায় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব বেশ পরিবর্ত্তিত হয়। তিনি একটা বিরাট কর্ম্ম-যজ্ঞের বিচিত্র ক্ষেত্রে নেমে দেশের নাড়ীর সংযোগ পেয়েছেন মনে করেছেন।—ছিন্নপত্র; ৩০ শ্রাবণ, ১৩০২।

কোম্পানীর এত কাণ্ডের পরেও তিনি তোমার উপর উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। রবিকাকার চেহারা দেখে আমরাও একটু ভীত হয়ে পড়েছি। কিন্তু তুমি ভয় পেয়ো না।”

যজ্ঞেশ্বরবাবু অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে তাঁর হাতবাক্সের সামনে ব'সে একমনে রোকড় লিখছেন, এমন সময়ে রবীন্দ্রনাথ যে নিঃশব্দে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন তা টেরই পান নি। দেখতে পেলেন, রোকড়ের খোলা বইখানা একটা অদৃশ্য হাত সশব্দে বন্ধ ক'রে দিল। সামনে চেয়ে যজ্ঞেশ্বর হকচকিয়ে ফরাস থেকে নেমেই সৌম্য-প্রশান্তমূর্ত্তি রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখে তাঁর ভয় হ'ল।

রবীন্দ্রনাথ বললেন—“যজ্ঞেশ্বর, শোন, কথা আছে।” এই ব'লে তিনি ধীরে ধীরে কুষ্টে কুঠী-বাড়ীর দক্ষিণের মাঠের প্রান্তে এসে, হেসে বললেন—“যজ্ঞেশ্বর, কোম্পানীর ব্যাপার দেখে তুমি জমিদারীর আমলাগিরির মধ্যে বহাল হতে চাও নাকি?”

যজ্ঞেশ্বরবাবুর ভয় বেড়ে গেল, কি একটা সাংঘাতিক ব্যাপারের আশঙ্কা ক'রে তিনি নীরবে মাথা নীচু ক'রে রইলেন।

রবীন্দ্রনাথ বললেন—“এই কোম্পানী আমি তোমাকে দিতে চাই, তুমি নাও। আমরা অব্যবসায়ী—কোম্পানী আমাদের ঘাড়ে অপদেবতার মত চেপে বসেছিল। কিন্তু তুমি এই কোম্পানী থেকেই লক্ষ্মী লাভ করবে,—আমি এই কথা আজ ব'লে দিলাম।”

যজ্ঞেশ্বরবাবু চিন্তা করতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন—"সবাই কি পরের গোলামী করতে পারে? তুমি যে গোলামী করবে না তা আমি জেনেছিলাম সেই দিন, যেদিন তুমি আমার 'সাধনা' পত্রিকার টাকাগুলো আদায় করেছিলে। যদিও আমরা আজ এই ব্যবসা ত্যাগ ক'রে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলতে চাই,—তুমি সিন্ধবাদের মত এই অপদেবতাকে ঘাড়ে নাও। তোমার ভাল হবে। ভয় পেয়ো না। মনে ক'রো না—নিজের সর্ব্বনাশ তোমার মত গরীব মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে আমরা পালাচ্ছি। টাকার জন্য ভেবো না। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তোমার কাছে মা লক্ষ্মী ধরা দেবেন।"

মুগ্ধ স্তম্ভিত যজ্ঞেশ্বরবাবুর কানে এই কথাগুলো দৈববাণীর মত ঝঙ্কৃত হ'ল। বিস্ময়ে আনন্দে বললেন—"তা হলে হুজুর, এই সব কলকব্জা কি আমায় দেবেন? এর দাম কত তা কি জানেন হুজুর?"

রবীন্দ্রনাথ বললেন—"কত বল দেখি? ক'হাজার টাকা?"

যজ্ঞেশ্বর বললেন—"এর ঠিক দাম যা, তা আমায় বেচলেও হবে না।"

রবীন্দ্রনাথ হো-হো ক'রে হেসে বললেন—"ওঃ, সাংঘাতিক কথা বলেছ তুমি! শোন—তোমাকে সাহায্য করবার জন্য অনুগ্রহও করব, আবার তোমার নূতন জীবনের পত্তনের জন্যে কিছু মূল্যও তোমায় দিতে হবে। তবু ভয় পেয়ো না। কলকব্জা

ও মালপত্রের একটা তালিকা ক'রে, প্রত্যেকটার দাম ধ'রে নিয়ে এস দেখি আমার কাছে।"

সেইদিন সন্ধ্যায় কুষ্টে কুঠী-বাড়ীর দোতলায় যজ্ঞেশ্বরবাবু রবীন্দ্রনাথের কাছে তালিকা পেশ করলেন। সুরেন্দ্রনাথ সেখানে উপস্থিত। রবিবাবু বেশ মনোযোগ দিয়ে তালিকাটা দেখে নিলেন, পরে বললেন—"শোন সুরেন, ব্যবসা চালানো আমাদের কর্ম্ম নয়। কিন্তু যে ব্যবসা বোঝে, তার শক্তিকে নষ্ট না ক'রে তাকে ব্যবসার সুযোগ দিতে হবে। যজ্ঞেশ্বর এতকাল যে সব জিনিস নাড়াচাড়া করেছে তাতে ওর মায়া জন্মেছে, ওগুলোর উপর ওর কিছু দাবীও আছে। তাই এসব জিনিস আমি ওকে দিতে চাই। তবু মূল্য বাবদ নামমাত্র তিন হাজার টাকা যজ্ঞেশ্বর আমাদের দেবে। গরীব মানুষ, ও টাকাও ও একটা বার্ষিক কিস্তীবন্দী-সুরত দেবে। আর কুষ্টে কুঠী-বাড়ীর পূবদিকের ফ্যাক্টরী ও বাসাবাড়ীর বাবদ দুই বিঘা জমি ওকে দিতে হবে। তার ন্যায্য খাজনা বছরে পঞ্চাশ টাকা ও দেবে। আমরা তো আর ক্ষতিগ্রস্ত হ'ব না, ও এই ক্ষতির স্তূপের উপর নিজেকে গ'ড়ে তুলুক।"

রবীন্দ্রনাথের অনুপম বাচন-ভঙ্গী, সঙ্গীতময় কণ্ঠ ও সহানুভূতির অমৃতে যজ্ঞেশ্বরবাবু বাক্যহারা; কৃতজ্ঞতায় তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। রবীন্দ্রনাথ বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন জমিদার। এই কলকব্জা, মালপত্র উচিত দামে বিক্রী করলে

তাঁর অনেক টাকা উঠে আসবে,—তা' না ক'রে আশ্রিতকে প্রতিপালনের জন্য তাঁর কী অপরিসীম আগ্রহ! কথাগুলো তাঁর কাছে ভগবানের আশীর্ব্বাদের মত মনে হ'ল।

সুরেন্দ্রনাথ বললেন—"বেশ ব্যবস্থা হয়েছে। কেমন যজ্ঞেশ্বর, তুমি ব্যবসা চালাতে পারবে ত?"

রবীন্দ্রনাথ নিরুত্তর যজ্ঞেশ্বরবাবুকে বললেন—"যজ্ঞেশ্বর, এখনো ভাবছ? আমি বলছি, এতে তোমার মঙ্গল হবে।"

যজ্ঞেশ্বর অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় রবীন্দ্রনাথের চরণ স্পর্শ ক'রে প্রণাম ক'রে বললেন—"হুজুর, আপনাদের এত দয়া! এই কলিকালে এ যে কেউ কল্পনাও করতে পারে না। আপনার আশীর্ব্বাদ সম্বল ক'রেই আমি চলব। আপনার নিজ মুখের আশীর্ব্বাদই আমায় মানুষ করবে।"

সব ব্যবস্থা হয়ে গেল—দলিল লেখাপড়া হয়ে গেল।* যজ্ঞেশ্বরবাবু আজ কুষ্টের একজন স্বনামধন্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী।

এ বিষয়ে প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়

* এই ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পাটের কারবারে নিজে লক্ষাধিক টাকা ঋণগ্রস্ত হন। তখন তিনি বিরাট কর্ম্ম-যজ্ঞের আয়োজন সুরু করেছেন শান্তিনিকেতনে। তবু এই দুঃসহ ঋণভার ও অর্থাভাব তাঁকে বিচলিত করতে পারে নি। পাটের কারবারের দেনা তিনি যে কত কষ্টে ও অপরিসীম ধৈর্য্যে পরিশোধ করেন, তার কাহিনীও এ অঞ্চলে গল্পে ও ছড়ায় সুপরিচিত।

মহাশয় লিখেছেন—"রবীন্দ্রনাথ ব্যবসায়ে অত্যন্ত অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পৈত্রিক জমিদারীর আয় হইতে পাটের ব্যবসায়ের ঋণ পরিশোধ করিতে থাকেন। এজন্য তিনি বোধ হয় সান্ত্বনা লাভের আশায় লিখিলেন—আকাশে জাল ফেলিয়া তারা ধরাই তাঁহার ব্যবসা, অতএব

'থাক্‌গে তোমার পাটের হাটে মথুর কুণ্ডু শিবু সা।'

যে কুমারখালী কবিবরের সুবিস্তীর্ণ পৈত্রিক জমিদারীর অন্তর্গত, সেই কুমারখালীর অধিবাসী মথুর কুণ্ডু ও শিবু সাহা (?) প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যবসায়ী ছিলেন। রাজসাহী জেলার আত্রাই-ঘাট রেলষ্টেশনের কিছুদূরে তাঁহাদের যে জমিদারী কাছারী আছে (পতিসর, কালীগ্রাম জমিদারী) তাহার এলাকাস্থিত কোন গ্রামের একজন ধনাঢ্য অধিবাসীর নিকট কবিবর পাটের ব্যবসার জন্য এক লক্ষ টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলেন। ঋণদাতা তাঁহাদের কবি জমিদারকে এতই বিশ্বাস করিতেন যে, তিনি কোন দলিল-পত্র না লইয়া কেবল মুখের কথায় এক লক্ষ টাকা ধার দিয়াছিলেন। কবিবর জমিদারী পরিদর্শন উপলক্ষ্যে তাঁহার কাছারীতে গমন করিলে বৃদ্ধ মহাজন সাহাজী তাঁহার কাছারীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্মরণ করাইয়া দিলেন, টাকাটা আর কয়েক সপ্তাহ পরেই তামাদি হইবে। কবিবর হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'ভদ্রলোক যে টাকা ধার করেন—তা কি কখনো তামাদি হতে পারে? তুমি নিশ্চিন্ত থাকো বেণী।'

যে সময়ে তামাদি হইবার কথা, তাহার কয়েক দিন পূর্ব্বেই কবিবর এই ঋণ পরিশোধ করেন। তাঁহারা উভয়েই পরস্পরকে চিনিতেন; কিন্তু দেশের যে অবস্থা, কিছুদিন পরে এ সকল কথা উপকথায় পরিণত হইবে।"

—মাসিক বসুমতী, ভাদ্র, ১৩৪৮

গত ১৩৩০ সালের মাঘ মাসে রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ ও মহামতি এণ্ডরুজের সঙ্গে যখন শেষবার শিলাইদহে এসে ফিরে যান, তখন কুষ্টে ষ্টেশনে যজ্ঞেশ্বরবাবু তাঁদের প্রণাম ক'রে তাঁর বাড়ীতে পদধূলি প্রার্থনা করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেখেই উৎফুল্লমুখে বললেন—"কেমন যজ্ঞেশ্বর, আমার কথা ফলেছে ত? সেই ত্রিশ বছর আগেও তোমাকে চিনতে আমার দেরী হয় নি। কাজ বেশ ভাল চলছে ত?"

কৃতজ্ঞ যজ্ঞেশ্বরবাবু সেদিন অশ্রু সংবরণ করতে পারেন নি। পুনরায় বাবু-মশায়ের পা ধ'রে বলেছিলেন—"যে দেবতার আশীর্ব্বাদে যজ্ঞেশ্বরের সিদ্ধিলাভ হয়েছে, তাঁর পায়ের ধুলো কি একটিবার পাব না হুজুর?"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শেষ কথাগুলো তাঁর বুকে শেলের মত বাজল—"সেদিন আর নেই যজ্ঞেশ্বর, আজ আমি ভূতের বোঝা বয়ে ক্লান্ত, চললাম।"

চট্টগ্রাম মেল তাঁকে নিয়ে হুস্-হুস্ ক'রে দৌড় দিল।

পুরাতন ভৃত্য

"পুরাতন ভৃত্য" কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের নিছক 'কল্পনা-প্রসূত ব'লে আমার মনে হয় না; কারণ তাঁর বাস্তব জীবনে ভৃত্য-বাৎসল্য দেখে তাঁর দরদী প্রাণের "আজ সাথে নেই চিরসাথী সেই মোর পুরাতন ভৃত্য" কথাগুলোর অন্তর্নিহিত করুণা ও স্নেহপ্রবণতার গভীরতা বেশ বুঝা যায়। কেষ্টাকে নিয়ে তিনি বেশ কৌতুকের সৃষ্টি করেছেন—আবার চোখের জলও টেনে বার করেছেন কল্পনার তুলিতে। আজ তাঁর বাস্তব জীবনের ভৃত্য-স্নেহের কয়েকটি গল্প বলব। এতে আমরা দেখতে পাব—মহাপুরুষ অন্তরে বাইরে, সদরে অন্দরে—সর্ব্বত্রই মহাপুরুষ!

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চাকরের কথা আমি জানি। তাদের কথা তাঁর পত্র-সাহিত্যে অমর হয়ে রয়েছে। এরা অতি সাধারণ লোক হয়েও ভাগ্যবান যে, এদের অনেক কথা রবীন্দ্র-সাহিত্যে স্থান পেয়েছে, যুগযুগান্তর পর্য্যন্ত রসপিপাসুর মনের ভিতর এদের স্মৃতি জেগে থাকবে।

(১) **উমাচরণ** রবীন্দ্রনাথের খাস চাকর ছিল। বাড়ী ছিল তার যশোহর জেলায়। লোকটা খুব বুদ্ধিমান ও কর্ম্মঠ ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাকে খুব ভালবাসতেন, এমন কি তার

কাজকর্ম্মে মনে হ'ত যেন সে রবীন্দ্রনাথের অভিভাবক। শুনেছি, লোকটি ছিল বেশ সুদর্শন আর বেশ মিশুক প্রকৃতির।

কমলাপুরের (শিলাইদহ জমিদারীর একটা বড় পল্লী) দ্বারি বিশ্বাস * একজন বুদ্ধিমান ও নামকরা প্রজা; তিনি পরে জমিদারীর মধ্যে তদারক-নবীশের পদেও অনেক দিন কাজ ক'রে খুব খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। দ্বারি বিশ্বাস প্রজা-হিসাবে যখনই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, তখনই সেই অঞ্চলের উৎকৃষ্ট ফলফুলারী বা খাবার জমিদারবাবুর জন্য নিয়ে আসতেন। এতে একদিন রবীন্দ্রনাথ খুব অনুযোগ করেন, তখন দ্বারি বিশ্বাস বলেছিলেন—"প্রিয়জন বাড়ীতে এলে মূর্খ লোকেরা আর কিছু না ক'রে মনের সাধ মিটিয়ে খাইয়ে থাকে। এতে রাগ করলে হুজুরের জমিদারীতে আসা বন্ধ করতে হবে।"

একবার দ্বারি বিশ্বাস তাঁরই গাছের অতি উৎকৃষ্ট পাঁচ ছড়া মর্ত্তমান কলা আর দু'টি অতিকায় কাঁঠাল বাবু-মশায়ের সামনে রেখে প্রণাম করলেন। ঐ অতি উৎকৃষ্ট প্রকাণ্ড ফলক'টি কুঠী-বাড়ীর একতলায় জালের আলমারীর মধ্যে রাখা হয়েছিল। বাবু-মশাই খাবার সময় এক-আধটা কলা ও কাঁঠালের কোয়া খেতেন, তাইতে অতগুলো সুন্দর মর্ত্তমান কলা আর কাঁঠাল নষ্ট হয়ে যাবার মত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন শিলাইদহে একা। তাঁর সহধর্ম্মিণী আর ছেলেমেয়ে সব কলকাতায়।

* এঁর বিষয় আরো জানা যাবে আমার "সেকালের রবীন্দ্রতীর্থে"।

রবীন্দ্রনাথ তখন সাহিত্য-সাধনায় মগ্ন। সারাদিন ও রাত্রির মধ্যে সকাল বা সন্ধ্যায় কোনও এক সময়ে গ্রামের মধ্যে বা মাঠে বেড়াতে যেতেন। পাকা কাঁঠালের গন্ধে কুঠী-বাড়ীর একতলাটা ম'-ম' করত। রবীন্দ্রনাথ একদিন ভোরে বেড়িয়ে ফিরবার সময় ঐ সুগন্ধে আকৃষ্ট হয়ে পাশের কামরায় গিয়ে দেখেন কাঁঠাল আর কলাগুলো কালো রং ধ'রে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ ডাকলেন—"উমাচরণ!"

উমাচরণ হাজির। রবীন্দ্রনাথ বললেন—"এমন সুন্দর কাঁঠাল আর এমন খাসা মর্ত্তমান কলাগুলো পচিয়ে ফেলে দিবি তোরা? তোরা কি গেরোস্তালী জানিস্ নে?"

উমাচরণ মনে মনে গজ্‌গজ্‌ করতে লাগল—পচতে পচতেও আরো এক হপ্তা তাঁর খাওয়া চলবে। সে তাই অনেক যত্ন-তদ্বির ক'রে ফলগুলো রেখে দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বললেন—"আমি তো খাচ্ছিই, তোরা এতদিন খেলে আর পচিয়ে ফেলে দেবার দরকার তো হ'ত না। এমনিই তোদের খাবার কষ্ট হচ্ছে।"

উমাচরণ উত্তরে হেসে বলল—"আমি একা খেলে তো চলে না—এখানকার পাঁচ-ছ'জন বরকন্দাজ কুঠী-বাড়ীর পাহারায় রয়েছে, তাদেরও দিতে হয়। আর শুধু তাই নয়, এমন সুন্দর কাঁঠাল আর কলা খেতে হলে পয়সা খরচ করতে হয়।"

রবীন্দ্রনাথ বললেন—"বেশ তো, তোরা সবাই মিলে

ফুর্ত্তি ক'রে খা। বেশ সরু চিঁড়ে আর ঘন দুধ কিনে নে। কেন বাপু অমন সুন্দর জিনিসগুলো পচিয়ে ফেলে দিবি?"

পাশের ঘরে কুঠী-বাড়ীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন, তাঁর কানে একথা গেল। রবীন্দ্রনাথ যাবার সময় ব'লে গেলেন—"ওদের দুধ চিঁড়ে মিষ্টি কিনে দিও আজই।"

সেই দিনই বাজার থেকে আট সের দুধ আর গয়ানাথ পালের দোকান থেকে সরু চিঁড়ে আর সন্দেশ কিনে এনে উমাচরণ সন্ধ্যার সময় মহা ফুর্ত্তিতে অন্যান্য বরকন্দাজদের নিয়ে সপাসপ্ ফলার লাগিয়ে দিল। সাহিত্য-সাধনায় মগ্ন রবীন্দ্রনাথ একতলায় নেমে এসে উমাচরণদের ফুর্ত্তির ফলার দেখে গেলেন।

(২) **ভোলানাথ**কে আমি কবির জোড়াসাঁকো ভবনে মাঝে মাঝে দেখেছি। লোকটার চেহারাখানা বেশ সুঠাম। তার মুখের লম্বা গোঁফ আর সেই গোঁফজোড়ার পারিপাট্য বেশ লক্ষ্য করবার মত। সে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, জাপান ইত্যাদি ঘুরে এসেছে; সাড়ম্বরে তারই গল্প সে শোনাত সবাইকে। জার্ম্মানির কোন্ সাহেব রবীন্দ্রনাথের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল, ইউরোপের বড় বড় রাজধানীতে তাঁকে দেখার জন্য কী ভয়ঙ্কর ভিড় হ'ত, অনেক মেমসাহেব তাঁকে যীশুখৃষ্ট বলত; বড় বড় সভা-সমিতিতে যাবার সময় কবি কি ভাবে যেতেন,—এই সব গল্প সে মাঝে মাঝে রাত্রে অসাধারণ গর্ব্বের সঙ্গে ব'লে যেত।

(৩) রবীন্দ্রনাথের আর একটি পুরাতন ভৃত্য ছিল। সে হচ্ছে **বিপিন**। বিপিন ছিল জবরদস্ত চাকর, তাকে দেখে সবাই ভয় পেত। সে সময় শিলাইদহ সদর কাছারীর খাজাঞ্চী (স্বর্গীয় হরমোহন নন্দী) বলতেন—"বিপিন ঠগাবগা লেখাপড়া যতটুকু জানুক আর না-ই জানুক, সে তদ্বিরের জোরে সেরেস্তায় ব'সে একজন পাকা আমলার কাজও করতে পারত।"

সে ছিল ভয়ানক হিসেবী, অতিরিক্ত সাবধানী আর অত্যন্ত বিশ্বস্ত। জমিদার-বাবুদের কোন ফরমাশ যদি কোন আমলা বা বরকন্দাজ ঠিক ভাবে তামিল না করত তা হলে আর রক্ষা ছিল না। তার বোল-চাল কায়দা-কানুন দেখে সাধারণের একেবারে তাক্ লেগে যেত। সব কাজেই সর্দ্দারী করার দিকে তার খুব ঝোঁক ছিল। তাকে দেখে ছোট বড় সবাই সমীহ ক'রে চলত। শুধু তাই নয়। বিপিন চ্যাঁচামেচি, সোরগোল খুব পছন্দ করত। কুঠী-বাড়ীতে অতিরিক্ত হৈ-চৈ থাকলেই বুঝতে হ'ত যে সেবারে বাবু-মশায়ের সঙ্গে বিপিনও এসেছে। আমরা মাঝে মাঝে গোলাপফুলের লোভে কুঠী-বাড়ীতে বাগানের আশেপাশে ঘুরতাম, কিন্তু বিপিন আমাদের দেখতে পেলেই আমাদের মতলব বুঝত,—আর আমাদের নিরাশ করত না। বিপিনের অতিরিক্ত কড়াকড়ি ও হৈ-চৈ দেখে রবীন্দ্রনাথ নাকি বলতেন—"বিপিনের সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্।"

(৪) শিলাইদহের প্রাচীনদের কাছে রবীন্দ্রনাথের আর

একটি পুরাতন ভৃত্যের কথা শোনা যায় একটা বিশেষ বিপজ্জনক ঘটনার সংস্রবে। সে হচ্ছে **প্রসন্ন**। সে ঘটনার বর্ণনা 'ছিন্নপত্রে' পাওয়া যায় (শিলাইদহ, ১৮৮৮)। সেদিন জ্যোৎস্না রাত্রে চরের মধ্যে বেড়াতে বেড়াতে কবির ভাইপো বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী অনেক দূরে চরের মধ্যে নিখোঁজ হয়ে যান। রবীন্দ্রনাথ বোটের সামনেই চরে পায়চারী করছিলেন। প্রকাণ্ড চরের মধ্যে অতি প্রত্যূষে, জ্যোৎস্না রাত্রে সপরিবারে বেড়াতে তিনি খুব ভালবাসতেন, অনেক সময়ে ধ্যানস্থভাবে পদ্মার প্রকাণ্ড সৈকত ভূমিতে একাকী বেড়াতেন।

রাত অনেক হয়ে যায়, তবু কবিগৃহিণী, বলু এঁরা ফেরেন না। রবীন্দ্রনাথ ক্রমেই ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি ভৃত্য প্রসন্নকে পাঠালেন। লণ্ঠন নিয়ে বোটের মাল্লা গফুর মিয়া তার পঁ্যাজরসুনের কাবাব রান্না ফেলে বেরোল' লাঠি হাতে নিয়ে। তা'রা সারা চরময় খুঁজছে। তাদেরও আর খোঁজ নেই। রবীন্দ্রনাথ ডাকছেন, "বলু", কোন সাড়া নেই। আবার তিনি হাঁকছেন,—"প্রসন্ন, গফুর,"—তাদেরও কোন সাড়া নেই। আবার শোনা গেল অনেক দূরে প্রসন্ন হাঁকছে, "ছোটমা!" এইভাবে সেই প্রকাণ্ড মরুভূমির মধ্যে শুধু হাঁকাহাঁকি চলেছে আর চারদিকে নির্জ্জন নিশীথিনীর বুক চিরে উদাস প্রতিধ্বনি ফিরে আসছে।

তখন কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাস হবে। পদ্মার জল সরছে হু-হু ক'রে। চরে নানা জায়গায় চোরা বালি, সাপের ভয়। বলেন্দ্রনাথের ছিল মূর্চ্ছার রোগ, তিনিই আবার তাঁর ছোট কাকীকে চরে বেড়াতে নিয়ে গেছেন নিজে পথ-প্রদর্শক হয়ে। রবীন্দ্রনাথ মহা চিন্তিত ও ভীত হয়ে পড়লেন। বহুক্ষণ খোঁজাখুঁজিতেও তাঁদের সন্ধান মিলল না। আরো বরকন্দাজ বেরিয়ে পড়ল; সারা চর খুঁজে তা'রাও ফিরে এল।

অনেকক্ষণ পরে বলেন্দ্রনাথ ছোট কাকীকে নিয়ে দু'জনে সারা পায়ে কাদা মেখে একখানা ডিঙ্গী ক'রে প্রসন্নের সঙ্গে ফিরে এলেন। প্রসন্ন বলল—"ছোটমা আর বলুবাবু রাস্তা ভুলে কাল্‌কেপুরের চরের দিকে চ'লে যাচ্ছিলেন। আমি আর গফুর না থাকলে তাঁরা পাবনা জেলার কোন একপ্রান্তে চ'লে যেতেন।" রাত্রে চরের মধ্যে কিছুই চেনা যায় না,—চেনা জায়গাও ভুল হয়। সে এক মহা বিপদ। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের পেয়ে শেষে হাঁফ ছাড়লেন।

প্রসন্নের নামটি তার স্বভাবের অনুরূপ। সে ছিল স্থির, সদা-প্রসন্ন। কবিগৃহিণীর খুব পছন্দমত চাকর ছিল প্রসন্ন, সে নাকি তার ছোটমার মুখ দেখলেই তাঁর অভিপ্রায় বুঝতে পারত। প্রসন্ন শিলাইদহের সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিল।

(৫) এইবার **ফটিক সেখের** গল্প বলব। ফটিক সেখ শিলাইদহের লোক, দেখতে বেশ সুপুরুষ, গৌরবর্ণ লম্বা মানুষটি,

মুখে সুন্দর দাড়ি। সে বাবু-মশায়ের বাবুর্চি ছিল। মৃণালিনী দেবী তাকে খুব ভাল রান্না শিখিয়েছিলেন। ফটিক বাবুর্চিপদ পাবার পরেই তার পদবী হ'ল 'ফরাস'। ফটিক ফরাস খুব সেয়ানা ও রসিক লোক ছিল। সে বহুদিন বাবু-মশায়ের বাবুর্চিগিরি করেছিল এবং সে পদগর্ব্বে মাঝে মাঝে পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে উদ্ধত ব্যবহার করত।

ফটিক ফরাস পাকা বাবুর্চি ছিল বটে, কিন্তু তার অনেক-গুলো দোষ ছিল। ফটিককে একটি প্রকাণ্ড পরিবার প্রতিপালন করতে হ'ত। সে নিজে বেশ ভাল মাইনে পেত, কিন্তু তার ভাইরা কোন কাজকর্ম্ম করত না; সামান্য জমিজমাগুলো দেখে-শুনে খেতে জানত না—জানত শুধু ফটিকের ঘাড়ে ব'সে খেতে। ফটিকেরও ছেলেমেয়ে কয়েকটা ছিল। তাইতে ফটিকের অভাব মিটত না; নানা ফন্দি-ফিকির ক'রে তার উপরি উপার্জ্জনের নূতন পন্থা বের করতে হ'ত।

রবীন্দ্রনাথ ফটিকের এই গুরুতর দোষের কোন খবর জানতেন না—তবে ফটিককে যে একটি বৃহৎ গোষ্ঠীর পেট ভরাতে হয় তা জানতেন; তাই তাকে কিছু জমিও দিয়েছিলেন। তবু প্রায়ই কুঠী-বাড়ীর ঘি, ময়দা, মিষ্টি প্রভৃতি কম প'ড়ে যেত। ফটিক একবার এইজন্যে ধরা পড়ে এবং তার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের কাছে নালিশ হয়। তাতে বাবু-মশাই বলেছিলেন,

"ফটিকের এত বড় সংসার, তোমরা তাকে ক'টাকা মাইনে দিয়ে থাক ? তার কাছে জিনিসপত্তরের অত কড়াকড়ি হিসেব নেবার দরকার কি ?"

শিলাইদহ কুঠী-বাড়ীতে প্রজারা সময়ে অসময়ে দরবার করতে আসত। রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই সাহিত্যসাধনায় মগ্ন থাকলেও প্রজারা এলেই তিনি তৎক্ষণাৎ তাদের অভাব-অভিযোগ শুনতেন—হুকুম দিতেন, তাদের সঙ্গে বেড়াতেও যেতেন। ফটিক কোনো কোনো প্রজার কাছে ঘুস নিয়ে দেখা করার সুবিধা ক'রে দিত—আবার কিছু আদায় না হলে কোনো কোনো প্রজাকে ফিরিয়ে দিত ! কি ক'রে যেন রবীন্দ্রনাথের কানে এই কথা গেল। তিনি একদিন অত্যন্ত বেদনাপূর্ণ স্বরে বললেন—"ফটিক, তোর হাতে আমি আর খাব না। তোর হাতে খেলে আমার পাপ হবে। তুই যা। বাড়ী চ'লে যা,—আমার সুমুখ থেকে চ'লে যা।"

রবীন্দ্রনাথের মৃদুস্বরে তিরস্কারের একটা নিজস্ব ভঙ্গী লোকের মনে ক্ষুরের মত আঘাত করত। তিনি রেগে বা অসন্তুষ্ট হয়ে আমাদের মত চ্যাঁচাতেন না, কিন্তু তাঁর বড় বড় চোখ দুটি দেখে অপরাধীর বুকের রক্ত হিম হয়ে যেত। তাঁর ঐ দুটি কথা এমন গভীরভাবে ফটিকের অন্তরে ঘা দিয়েছিল যে, ফটিক সেদিন বাড়ী গিয়ে রাত্রে খুব কেঁদেছিল। এর আগেও ফটিকের একটা চালাকী বাবু-মশাই ধরেছিলেন, সে

অপরাধে তার গুরুতর জরিমানা হয়েছিল। কিন্তু সেইদিন থেকেই আর কেউ ফটিককে ঘুসের অপবাদ দিতে পারে নি।

ম্যানেজারবাবুর কাছে এর পরে একটা খুব গুরুতর রকমের মামলা' হয়। সেই মামলায় ফটিক আর তার ভাই ছিল আসামী। মামলার বিচারে ফটিকের দণ্ড হ'ল, কিন্তু খুব লঘুদণ্ড হয়েছিল। কি ক'রে যেন সেই কথাটাও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কানে যায়। বাবু-মশাই খুব গোপনে ঐ মামলার বাদীদের ডাকিয়ে সমস্ত ব্যাপার জেনে নিয়েছিলেন।

বাবুর্চি হিসেবে ফটিক ফরাসের একটুও খুঁত ধরবার উপায় ছিল না,—তার মত খাসা বাবুর্চি দুষ্প্রাপ্য ছিল। সাহেবরাও তার কাজ দেখে খুব খুশি হতেন। তখন শিলাইদহে বড় বড় সাহেব ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটরা প্রায়ই বেড়াতে আসতেন।

এই ব্যাপারের পরেই একদিন হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ অসময়ে ফটিক ফরাসকে তাঁর খাস কামরায় ডেকে পাঠালেন। ফটিক হাজির হলে তিনি বলেছিলেন, "তোকে তো আর রাখা চলে না ফটিক, তোকে দূর ক'রে দেব—পদ্মাপার ক'রে তোকে তাড়িয়ে দেব। তুই আমার সঙ্গে থাকিস্ আর লোকের উপর এমন অত্যাচার করিস্?"

ফটিক কেঁদে ফেলেছিল, নিজের দোষ অকপটে স্বীকার করেছিল এবং সেইদিন থেকেই ফটিকের সমস্ত দোষ সংশোধন হয়ে গিয়েছিল। এর পরে তার আর কোন অপরাধের বিষয়

শোনা যায় নি। সে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কাজ করেছিল। তার ছেলে, নাতি, এরাও জমিদারী সরকারে চাকরী করেছিল।

(৬) এইবার ঝগড়ু বেহারার কথা বলব। আমি ঝগড়ুকে খুব বুড়ো বয়সে দেখেছি কবির কলকাতার বাড়ীতে। তার যৌবনের কোন কাহিনী আমার জানা নেই। জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীতে ঝগড়ুর অত্যন্ত প্রতিপত্তি। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ক্বচিৎ কখনো আসতেন। সেজন্যে ঝগড়ুর কোন কর্ম্মই করতে হ'ত না,—ব'সে ব'সে মাইনে নিত আর তেতলার ঘর ক'খানা ঝাড়পোঁছ করত।

ঝগড়ুর সেরা কাজ ছিল ছাগল পোষা। তার ছিল লম্বা দাড়ি আর শিংওয়ালা এক রামছাগল। এই রামছাগলের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হতে হ'ত। আমি তখন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে কাজ করি। ঝগড়ুর আহ্লাদে রামছাগলের নাতি-পুতি এত হয়েছিল যে, তাদের অত্যাচার আমাদের নীরবে সহ্য করতে হ'ত। কারণ আমরা জানতাম,—ঝগড়ু আর তার রামছাগল-পরিবারের সাতখুন মাপ। যেমন বুড়ো ঝগড়ু, তেমনি তার দাড়িমুখো আদুরে রামছাগল—বাবু-মশায়ের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আসতেন, তখনই এক সময়ে বুড়ো ঝগড়ু আর তার ধাড়ী দাড়িমুখো রামছাগল তাঁকে দেখা দিয়ে যেত। বুড়ো ঝগড়ু বেহারার এতবড় পশার প্রতিপত্তি ছিল যে, অনেক সময়ে রবীন্দ্রনাথের পুত্র ও পুত্রবধূও

তাকে খুব সমীহ ক'রে চলতেন। ঝগড়ুর সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল, সে আমায় একটা রামছাগলের বাচ্চা দিয়েছিল।

ঝগড়ু বহুকালের পুরানো চাকর। সে ঠাকুর-বংশের অনেক কিছু দেখেছে—অনেককে কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ করেছে। সে অনেক সময় বলত—"রবিবাবু-মশাই জীবনে এত শোক-তাপ পেয়েছেন যে, সে রকম কোন বাবুই পান নি। আর বাবু, আমি তাঁকে কোনো দিন কাঁদতে দেখি নি—সংসারের জন্য ভাবতে দেখি নি। আর দেখুন—এই বুড়ো বয়সে একটু আরাম করবেন,—তা না, 'বিশ্ভারতী' না কি যেন ওর নাম,—তার জন্যে একেবারে পাগল হয়ে ক্ষেপে গেছেন, সারা 'পিথিমী' দৌড়ে বেড়াচ্ছেন। এতও সহ্য হয়? সব ছিষ্টিছাড়া কাণ্ড! এমন আর দেখি নি কোথাও!"

রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কাহিনী বলতে বলতে সে একেবারে ডুক্রে কেঁদে উঠত; বলত,—"বাবু, এমন সোনার চাঁদ ছেলে মারা গেলে মানুষ পাগল হয়ে যায়। আমি খোকাকে কোলে করতাম। তার সেই মুখখানা আমি প্রায়ই রাত্রে স্বপ্নে দেখি। সেদিন আমার খেতে ইচ্ছে হয় না—কোনো কাজকর্ম্ম করতেও ইচ্ছে হয় না।"

ঝগড়ু আরো অনেক গল্প করত,···বহুদিনের আগেকার শান্তিনিকেতনের গল্প,—মৃণালিনী দেবীর বিয়ের গল্প,—তাঁর সন্তানদের কত কাহিনী। বলত—আর বুড়ো কাঁদত।

এই স্নেহপ্রবণ ঝগড়ু—পুরাতন ভৃত্য ঝগড়ু রবীন্দ্র-সাহিত্যে অমর হয়ে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে যাবার সময় তাঁর স্নেহের নাতনীকে সোহাগ ক'রে সেই সমুদ্রের বুকের উপরে জাহাজে ব'সে ঘুমপাড়ানী ছড়া লিখছেন—

"এক যে ছিল বাঘ
তার গায় কালো দাগ,
তাই বেজায় হলো রাগ
ঝগড়ুকে তাই বল্লে হেঁকে—
যা এখুনি প্রাগ।"

(৭) বনমালী রবীন্দ্রনাথের শেষবয়সের চাকর ছিল। সে উড়িষ্যাদেশের অধিবাসী। তাকে রবীন্দ্রনাথ আপন সন্তানের মত ভালবাসতেন। তাকে নিয়ে রসিকতাও তিনি কম করেন নি। সে সাম্‌নে না থাকলে তাঁর খাওয়া হ'ত না। যেখানেই যেতেন পথের সঙ্গী থাকত বনমালী। বনমালীর জন্যে তাঁর ভাবনা-চিন্তার অন্ত ছিল না।

মৃত্যুর এক বছর আগে—১৩৪৭ সালের প্রথমে তিনি বনমালী ও সুধাকান্ত রায় চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে কালিগ্রাম জমিদারীতে প্রজাদের দেখতে যান। অনাবৃষ্টির জন্য সে বছর প্রজাদের বড় কষ্ট হচ্ছিল। এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই। আত্রাই ষ্টেশন থেকে তাঁরা নদীপথে বজরায় পতিসর রওনা হলেন। ভয়ানক রোদ। বজরার ছাদে বনমালীর বিছানার বাণ্ডিল ছিল।

হঠাৎ পতিসর পৌঁছাবার কয়েক ঘণ্টা আগে প্রচণ্ড বৃষ্টি এল। সকলের মনেই আনন্দ, প্রজারা জয়ধ্বনি করতে লাগল। পতিসরে পৌঁছে রাত্রে শোবার সময় দেখা গেল, বনমালীর বিছানার বাণ্ডিল বোটের ছাদে ভিজে ফুলে উঠেছে। আনন্দের আতিশয্যে তার বিছানাটা সরানোর কথা কারোর মনে ছিল না, খেয়ালও ছিল না। রাত্রি প্রায় ৯টা। রবীন্দ্রনাথ বেচারী শ্রান্ত বনমালীর বিছানার ঐ অবস্থা দেখে আগুন হয়ে উঠলেন, ম্যানেজারবাবুকে তখুনি ডাকিয়ে বকতে লাগলেন, "এই গোবেচারীর দিকে কেউ তাকায় না, সবাই আমায় নিয়েই ব্যস্ত।" ম্যানেজারবাবু সেই রাত্রে বনমালীর শোবার ব্যবস্থা ক'রে দিলে তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাণ্ডা হলেন। বনমালী আরাম ক'রে বিছানা পেতে নিলে বললেন, "শুয়ে ঘুমো বনমালী। তোর কষ্ট আর আমি দেখতে পারিনে।" দেশ-বিদেশের উপহৃত কোন ভাল খাবার জিনিস বনমালী না খেলে তাঁর তৃপ্তি হ'ত না।

শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী দেবীর লিখিত "মংপুতে রবীন্দ্রনাথ" বইএ এই সরল গোবেচারী, প্রভুগত-প্রাণ বনমালীর অনেক বর্ণনা পাঠকপাঠিকা প'ড়ে দেখবেন।

দ্বারি বিশ্বাসের ছেলে

কী কুক্ষণে ঠাকুরবাবুরা শিলাইদহ জমিদারীর লাগোয়া বোয়ালদহ মহাল খরিদ করেছিলেন—গোড়া থেকে শেষ অবধি দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদিতে বোয়ালদহ একটা দুষ্ট গ্রহের মত জমিদারীটাকে আঁকড়ে ধ'রে রইল। এই মহালের দখল নিয়ে যে অশান্তি দাবানলের মত জ্বলেছিল তা নিবাতে জলের মত অর্থবৃষ্টি করতে হয়েছিল। দ্বারি বিশ্বাস (দ্বারকানাথ বিশ্বাস) এই মহালের একজন পত্তনী স্বত্বের মালিক। স্বার্থ তাঁর সামান্যই, কিন্তু তিনি বেঁচে থাকতেই এমন মামলা-মোকদ্দমা জুড়ে দিলেন যে, জিদের বশে প্রবল-প্রতাপ ঠাকুর-জমিদারেরাও ঐ সামান্য স্বার্থের জন্য দীর্ঘকাল আইনের যুদ্ধ চালাতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের জয়লাভের আশা ক্রমেই কমে' যাচ্ছিল।

ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডের মত জিদের মামলা চলেছে। এমন সময়ে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে এসেছেন। বজরায় বাস করছেন। তখন দ্বারি বিশ্বাস পরলোকে।

বৈষয়িক প্যাঁচ বড় শক্ত প্যাঁচ। দ্বারি বিশ্বাসের একটা বড় জোত ছিল ঠাকুরবাবুদেরই বোয়ালদহ মৌজায়। মামলা-রত দ্বারি বিশ্বাসকে জব্দ করবার জন্য কি একটা ছুতোনাতায় আইনের ফাঁকে ঐ জোতটা খাস ক'রে নিয়ে ম্যানেজারবাবু

অন্য প্রজাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে ফেললেন। এইবারে সত্যিই দ্বারি বিশ্বাসের নাবালক ছেলেদের বাড়া ভাতে ছাই পড়ল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রজা দ্বারি বিশ্বাসকে বেশ ভাল রকম চিনতেন। তিনি ও তাঁর ছেলেরা যে মৃত্যুপণ ক'রে মামলা করছেন তাও জানতেন। নিজ ন্যায্য স্বার্থ বজায় রাখতে সম্ভ্রান্ত প্রজা দ্বারি বিশ্বাস মামলা করছেন—এইজন্যে দ্বারি বিশ্বাসের উপর তাঁর উচ্চ ধারণা একটুও খাটো হয় নি। তা'রা যে তাঁর সঙ্গে শত্রুতার শোচনীয় ফল ভোগ করবার জন্য বোয়ালদহের অমন সুন্দর বড় জোতটা হারাতে বসেছে তা কিন্তু তিনি জানতেন না।

একদিন দ্বারি বিশ্বাসের বড় ছেলে মন্মথ বিশ্বাস বোটের কাছে এসে রবীন্দ্রনাথের দর্শনপ্রার্থী হলেন। মন্মথ বিশ্বাস তখন তরুণ যুবক। বোটের খাস বরকন্দাজ বাবু-মশাইকে জানাল যে, দ্বারি বিশ্বাসের ছেলে মন্মথ বিশ্বাস দরবারের জন্য অনেকক্ষণ বোটের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন।

"দ্বারি বিশ্বাসের ছেলে? ডাকো তাকে।" রবীন্দ্রনাথ হুকুম দিলেন।

মন্মথ বিশ্বাস এসে কেঁদেকেটে রবীন্দ্রনাথের পা জড়িয়ে ধ'রে বললেন—"হুজুর, ধনে প্রাণে মারা গেছি। আমাদের বাঁচান।"

তরুণ যুবক মন্মথের চোখের জল, বেদনাতুর মুখখানা আর অপরাধীর মত ভীত চোখ দুটি রবীন্দ্রনাথকে বড়ই ব্যথিত করল। তিনি স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন—"তুমি দ্বারি বিশ্বাসের ছেলে? জান, দ্বারি বিশ্বাস আমাদের কে ছিল? তার ছেলে হয়ে তুমি মৃত্যুপণ ক'রে বাপের নাম ডুবোবে?"

মন্মথ বিশ্বাস চোখের জলে নেয়ে তাঁদের বর্ত্তমান অবস্থার কথা, বোয়ালদহের মামলার কথা, সব অকপটে বললেন।

বাবু-মশাই বললেন—"মামলা যখন তোমাদের বাড়ীতে ঢুকেছে, তখন তোমরা পথে না বসা পর্য্যন্ত সে তো এক পাও নড়বে না বাপু। বুঝতে পারছি—তোমার বাবাও ভুল করেছিল। সে ভুলের জের এতদূর এসে দাঁড়িয়েছে। বোয়ালের হাঁ,—তার মধ্যে ঢুকলে কি আর পুঁটী-খল্‌সে বাঁচে?"

"সে মামলায় তো আমরা সর্ব্বস্বান্ত হতে বসেছি; কিন্তু আমাদের বোয়ালদহের পৈত্রিক জোতটা খাস ক'রে নিয়ে আমাদের মুখের ভাত কেড়ে নিয়েছেন হুজুর।"—এই ব'লে মন্মথ বিশ্বাস আবার কেঁদে ফেললেন।

ব্যথিত রবীন্দ্রনাথ চমকে উঠলেন। তিনি অনেক প্রজার জমিজমার অবস্থা জানতেন। তিনি বললেন—"বৈষয়িক শত্রুতা চরম অবস্থায় দাঁড়িয়েছে, বুঝতে পেরেছি। তোমাদের বোয়ালদহের জোতটা কী ক'রে গেল?"

মন্মথ বিশ্বাস তাঁর স্বপক্ষে অনেক কথা বললেন, ম্যানেজার-বাবুর উপরও দোষারোপ করলেন এবং জানালেন যে, এ অবস্থায় হুজুরের দয়া ভিন্ন বোয়ালদহের জোত রক্ষা করার কোনই উপায়• নেই। তবে দয়া চাইবারও মুখ নেই, বোয়ালদহের মামলায় রাজার সঙ্গে ল'ড়ে যে অপরাধ হয়েছে তার শাস্তিও চূড়ান্তভাবেই দেওয়া হচ্ছে।

বাবু-মশাই ম্যানেজারবাবুকে ডেকে পাঠালেন। ম্যানেজার-বাবু এসে কাগজপত্রের সাহায্যে সমস্ত বিষয় সবিস্তারে বুঝিয়ে দিলেন যে, তাঁর একাজ আইনতঃ একটুও অন্যায় হয় নি, বিশেষতঃ এমন প্রবল শত্রুকে দমন না করলে জমিদারী চলতে পারে না।

বাবু-মশাই একটু করুণ মিনতির স্বরেই ম্যানেজারবাবুকে বললেন—"তুমি কি দ্বারি বিশ্বাসকে জান? দ্বারি বিশ্বাস কেমন খাসা লোক ছিল তা তো দেখ নি। তার ছেলেরা কি না খেয়ে মরবে? আমার বনেদী প্রজাদের ঘর ভেঙ্গে দেবে? তাদের অপরাধগুলোও সম্ভবমত ক্ষমার চোখে না দেখলে কি চলে?"

ম্যানেজারবাবু বললেন—"এদের ক্ষমা করলে আদর্শ খারাপ হয়ে যায়।"

তাঁর মুখের কথা শেষ না হতেই বাবু-মশায় বললেন—"তুমি দ্বারি বিশ্বাসকে দেখ নি, তাই অমন নির্দ্দয় হয়ে তার ছেলেদের

মুখের অন্ন কেড়ে নিয়েছ। না—না—না, বোয়ালদহের জোতটা ঐ ছোকরাকে ফিরিয়ে দাও, নইলে আমাদের পাপ হবে।"

ম্যানেজারবাবু বললেন—"আমি সে জোতটা আট-দশজন প্রজার সাথে বন্দোবস্ত ক'রে অনেকগুলো টাকা নিয়েছি। তাদের এখন কি বলব? তা'রা সে-সব জমিতে ধান বুনেছে,—তা'রা কি ছাড়বে?"

বাবু-মশাই বললেন—"সেই সব প্রজাদের ডাকো। আমি তাদের বুঝিয়ে বলব।···মন্মথ, তা হলে বোয়ালদহের মামলা কি আরও চলবে?"

মন্মথ হাত জোড় ক'রে বললেন—"না হুজুর, কালই আমি সে সর্ব্বনেশে মামলা তুলে নেব। এ মামলা চললে আমাদের বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না।"

বাবু-মশায়ের বোট তখন কালোয়ার চরেই বাঁধা ছিল। সেই সব নূতন বন্দোবস্তী প্রজাদের ডেকে আনা হ'ল। রবীন্দ্রনাথ তাদের ডেকে বললেন—"ওরে একটা ধার্ম্মিক লোকের নাবালক ছেলেদের এতকালের জমিগুলো তোরা আইনের ফাঁকে চষে' ফেললি? এই চেয়ে দেখ—দ্বারি বিশ্বাসের ছেলের মুখের দিকে। তোরা নজর দিয়ে জমি নিয়েছিস্ তো? বেশ, তোদের সে টাকা আমি ফিরিয়ে দেব। আমি হুকুম দিচ্ছি। এই ছেলেটার জমিগুলো ফিরিয়ে দিবি না তোরা? এদের মুখের ভাত কেড়ে খাবি?"

তা'রা তৎক্ষণাৎ সমস্বরে বলল—"হাঁ হুজুর, হুজুরের হুকুম আমরা নিশ্চয়ই মাথা পেতে নেব। তবে বড় কষ্ট ক'রে ধান বুনে ফেলেছি। আমরাই বিশ্বাস-মশায়ের বর্গাৎ হতে চাই। এই হুকুমটা দিন্ হুজুর।"

রবীন্দ্রনাথ মন্মথ বিশ্বাসের মুখের দিকে চাইতেই তিনি ব'লে উঠলেন—"আমি তাতেই রাজী। বাবু-মশায়ের হুকুম আমি মানব না? তাঁর হুকুম আমার কাছে ভগবানের হুকুম।"

রবীন্দ্রনাথের মুখখানা এতক্ষণে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন—"দেখো মন্মথ, মা-লক্ষ্মীকে তাড়াহুড়ো ক'রো না—তিনি বড় চঞ্চলা। বাপ-ঠাকুরদার বিষয় ধর্ম্মপথে থেকে দেখেশুনে ভোগ কর। তা হলেই দ্বারি বিশ্বাসের নাবালকেরা সত্যি সত্যি সাবালক হয়ে উঠবে।"

সমস্ত গোল মিটে গেল। প্রজারা নজরের টাকা ফেরৎ পেল। মন্মথ বিশ্বাসদের বোয়ালদহ মৌজার বহুকালের মামলা-মোকদ্দমারও অবসান হয়ে গেল।

চিতল মাছের পেটি

রবীন্দ্রনাথের পরিবারবর্গ তখন কিছুদিন স্থায়িভাবে শিলাইদহে আছেন। রবীন্দ্রনাথ কলকাতায়।

তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথের গৃহ-শিক্ষক পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব* কলকাতা থেকে শিলাইদহে আসবেন। তিনি কুষ্টে ঠাকুর কোম্পানীর কর্ম্মচারী যজ্ঞেশ্বরবাবুকে লিখলেন—"আমি অমুক দিনে অমুক ট্রেনে কুষ্টে নেমে, সেখানে খাওয়া দাওয়া ক'রে শিলাইদহ যাব। তার বন্দোবস্ত রাখবেন।"

কুষ্টে কুঠী-বাড়ীতে তখন রথীন্দ্রনাথের মামা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী কিছুদিন থাকতেন। তাঁর নিজের পাচক ও চাকর ছিল। কিন্তু পাচকটির পাককার্য্যের চেয়ে বাজার-কার্য্যেই বেশী নৈপুণ্য দেখা যেত। যজ্ঞেশ্বরবাবু সেজন্য পণ্ডিত-মশায়ের জন্যে ভাল রান্না-বান্নার ব্যবস্থা করলেন।

পণ্ডিত-মশাই কুষ্টে পৌঁছে স্নান সেরে খেতে ব'সে নানা রকমের নিরামিষ ডাল, ঝোল, তরকারী ইত্যাদি খেয়ে পরিতুষ্ট হয়ে বললেন—"এসব কি আপনার বাড়ীর মেয়েদের রান্না যজ্ঞেশ্বরবাবু? উড়ে ঠাকুরের হাতে তো এমন রান্না হয় না!"

---

* শান্তিনিকেতন সৃষ্টির সময়ে ইনি সেখানেও অধ্যাপক ছিলেন।

নগেনবাবু বললেন—"এসব যজ্ঞেশ্বর ঠাকুরের রান্না। খেতে পারছেন তো ?"

বিদ্যার্ণব মশায় বললেন—"বিলক্ষণ! পেটুক বামুনকে আপনারা পেট ফাটিয়ে মারবার জোগাড় করেছেন। দেখছেন না, আমি যে তিনজনের খোরাক উদরস্থ ক'রে ফেললাম!"

সত্যই বিদ্যার্ণব মশাই আহার সেরে, তিন-চার ঘণ্টা বিশ্রাম ক'রে আহারের গুরুভার একটু কমিয়ে পাল্কী চেপে শিলাইদহে চ'লে গেলেন।

পণ্ডিত-মশায়ের কুষ্টের অতিথি সৎকারের গল্প চিঠিপত্রে কলকাতায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কানেও গেল।

এই ব্যাপারের প্রায় এক মাস পরে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে আসবেন। তিনি নিজহাতে যজ্ঞেশ্বরবাবুকে চিঠি লিখলেন—"আমি কুষ্টে নেমে, খেয়ে যাব। তুমি আমার খাবার বন্দোবস্ত ক'রো ; বিরাট কিছু ক'রো না। আলুভাতে, ডালবাঁটা ভাতে, শাকভাজা আর চুনো মাছ।"

যজ্ঞেশ্বরবাবু মনিবকে ডালবাঁটা ভাতে খাওয়াবার বন্দোবস্ত করলেন, শিলাইদহে এ বিষয়ে কিছু জানালেন না। পদ্মা থেকে অতি প্রকাণ্ড এক চিতল মাছ আনালেন, আর গোপনে গোপনে মনিবসেবার রাজসূয় আয়োজন সেরে তৈরী হয়ে থাকলেন।

শিলাইদহ থেকে ম্যানেজারবাবু এই উপলক্ষ্যে কুষ্টে এসে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যজ্ঞেশ্বরবাবু বললেন—"বাবু-মশায়ের

জন্যে তাঁর হুকুমমত ডালবাঁটা আর শাকভাত ক'রে দেব; তার জন্যে আপনারা কিছু ভাববেন না।"

নগেনবাবু একটু হাসলেন।

যথাসময়ে রবীন্দ্রনাথ এসে কুষ্টে কুঠী-বাড়ীতে উঠলেন। অভ্যর্থনাদির কাণ্ডকারখানা মিটে গেলে স্নান সেরে তিনি খেতে বসলেন। খাবার ঘরে গিয়ে দেখেন—কাঁঠাল কাঠের প্রকাণ্ড একখানা পিঁড়ি, পাকাসোনার মত রং। আর তার সামনে প্রায় দুই ঘনগজ জায়গা জুড়ে রকমারি খাবার—থালায়, বাটিতে, রেকাবীতে—নানান কায়দায় থরে থরে সাজান। গরম খাবারের সুগন্ধে ঘরখানা ম'-ম' করছে। ঘরখানাতে যজ্ঞেশ্বরবাবু ভিন্ন আর কেউ নেই।

বাবু-মশাই ব্যাপার দেখেই বললেন—"যজ্ঞেশ্বর, এসব করেছ কী? ডালবাঁটা ভাতে আর আলুভাতেই আমি ভালবাসি। তুমি এসব কী কাণ্ড ক'রে ফেলেছ বল দেখি।"

যজ্ঞেশ্বরবাবু বললেন—"হুজুর যেদিন জমিদারীতে এসে ডালবাঁটা আর আলুভাতে ভাত খাবেন সেদিন আমাদের সবাইকে উপোস ক'রে থাকতে হবে।"

বাবু-মশাই হো-হো ক'রে উচ্চকণ্ঠে এমন হাসলেন যে, ঘরখানা গম্-গম্ ক'রে উঠল।

খেতে ব'সে রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেলেন, রকমারি খাদ্য-সম্ভারের মধ্যেও তাঁর ফরমাসী ডালবাঁটা ও আলুভাতে আছে।

বিপুল খাদ্য সমাবেশের সব রকমই একটু একটু ক'রে মুখে দিয়ে তিনি বললেন "যজ্ঞেশ্বর, এসব কি ক'রে খাব, ব'লে দাও।" একটু একটু ক'রে খেতে খেতে দেখেন একখানা বড় ডিসে এক ফুট লম্বা প্রকাণ্ড দুইখানা চিতল মাছের পেটি যেন সোনা মেখে হাসছে। রবীন্দ্রনাথ কচি ছেলের মত হাসতে হাসতে বললেন—"যজ্ঞেশ্বর, এ দুটি কোন্ চীজ্? মাছ নাকি? কি মাছ?"

যজ্ঞেশ্বরবাবু বললেন—"ও দু'খানা চিতল মাছের পেটি। ওর অন্ততঃ একখানা আপনাকে খেতেই হবে।"

রবীন্দ্রনাথের বোধ হয় আয়োজন দেখে বেশ ভাল রকম ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল। তিনি একখানা মাছই খেয়ে ফেললেন।* অন্যান্য অনেক রকমের মাছ মাংস ইত্যাদি একটু একটু মুখে দিয়ে উঠতে যাবেন, এমন সময়ে যজ্ঞেশ্বর বললেন—"হুজুর এ ডিস্খানায় হাত দিতে ভুলেই গেছেন। এতে আছে কুষ্টের তৈরী ভাল 'রাঘবসই'। এর একটা খেতেই হবে।"

রবীন্দ্রনাথ তার একখানা খেয়ে ফেললেন; বললেন—"চমৎকার।"

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে চ'লে এলেন।

শিলাইদহে এসে একদিন তিনি ছেলে, মেয়ে, জামাই, শিক্ষক

---

* এ সময়ে রবীন্দ্রনাথ মাছ মাংস সব খেতেন। পরে নিরামিষাশী হন।

ও কর্ম্মচারীদের নিয়ে একটা ভোজ দেবার ব্যবস্থা করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞেশ্বরবাবুকে শিলাইদহে তলব করলেন।

যজ্ঞেশ্বরবাবু শিলাইদহে এসে তাঁর সামনে দাঁড়াতেই বললেন—"যজ্ঞেশ্বর, শুনেছ তো? এই ভোজের ভার তোমার হাতে। আমাদের সব রকমের খাবার তুমি নিজে তৈরী করবে। ঠাকুর-চাকর সব তোমার ফরমাশ খাটবে। আমার ছেলে, মেয়ে, জামাই কেউ আজ ওদের হাতে খাবে না।"

বিদ্যার্ণব-মশাই ঘরে ছিলেন, বললেন—"যজ্ঞেশ্বরবাবু এসেছেন তো, বেশ। এখন থেকেই আদা-নুন খেয়ে ক্ষিধে পাকিয়ে নিই।"

সেদিনকার ভোজের সমারোহ তখনকার অনেকেরই মনে আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সহধর্ম্মিণী মৃণালিনী দেবীকে বললেন—"নাও, আজ আর তোমায় কত্তাগিরি করতে হবে না। আজ তোমার কত্তাগিরি যজ্ঞেশ্বরকে ছেড়ে দাও।"

শিলাইদহ কুঠী-বাড়ীর দোতলার হল্‌ঘরে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে পিঁড়ি পেতে খেতে বসলেন। তাঁর প্রাণখোলা হাসি যেন ঘরখানাকে শঙ্খধ্বনিতে পূর্ণ ক'রে দিল, স্বভাবসিদ্ধ নানা রকমের রঙ্গরস সবাইকে হাসাতে লাগল। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা তাঁর চারপাশে জটলা ক'রে ব'সে খেতে খেতে মধুর কলগুঞ্জন করতে লাগলেন। পরিবেশক স্বয়ং যজ্ঞেশ্বরবাবু।

রথীবাবুর ইংরেজীর শিক্ষক লরেন্স সাহেবও পিঁড়ি পেতে

জোড়াসন হয়ে ব'সে খুব খেলেন আর রবীন্দ্রনাথের নানান রসিকতায় হাসলেনও খুব। বিদ্যার্ণব-মশাই গুরুতর রকমেই ভোজন সমাপ্ত ক'রে লম্বা ঢেকুর তুলতে তুলতে বললেন—"যজ্ঞেশ্বরবাবু, আজও পেটুক বামুনকে আপনি জব্দ করেছেন।"

এদিকে লরেন্স সাহেব নীচের তলায় এসে হুঁকোয় তামাক খেয়ে সবাইকে হাসালেন। তিনি শিলাইদহে এসে হুঁকোয় তামাক খেতে শিখেছিলেন স্থানীয় লোকদের কাছে। হাস্য-কৌতুকে সেদিনকার ভোজ বড় আনন্দে পরিসমাপ্ত হয়েছিল।

যজ্ঞেশ্বরবাবুর কৃতিত্বে মহাসমারোহে ভোজ সাঙ্গ হ'ল। সেদিনকার ভোজেও পদ্মা থেকে আনা প্রকাণ্ড চিতল মাছের পেটি ছিল।

রবীন্দ্রনাথ খেতে খেতে উচ্চহাস্যে বার বার বলেছিলেন—"আমার বড় আদরের ইলিশ মাছের পেটিকেও হারিয়ে দিয়েছে যজ্ঞেশ্বরের এই চিতল মাছের পেটি।"

এঁর একটা সরস কাহিনী আছে আমার "সেকালের রবীন্দ্রতীর্থ" পুস্তকে।

দুই বিঘা জমি

রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনারই ইতিহাস আছে। তিনি চিঠিপত্রে সাহিত্যসৃষ্টির সময় ও ঘটনার কিছু কিছু উল্লেখ ক'রে গেছেন। তাঁর 'ছিন্নপত্রে' যে সব মানব-মানবী তাঁর সে যুগের দৈনন্দিন চিন্তাকে আশ্রয় ক'রে থাকত ব'লে আমরা পড়তে পাই, তা'রা তাঁর অনেক কবিতা ও গল্পে আত্মপ্রকাশ করেছে।* তাঁর 'পোষ্ট-মাষ্টার', 'বোষ্টমী', 'রামকানাই'—এগুলো যে বাস্তব চিত্র সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই, তবে সে চরিত্রগুলো কবির হাতের রং পেয়ে আরো মধুর—আরো উজ্জ্বল হয়েছে। পল্লীর অতি সাধারণ অতি দরিদ্র সর্ব্ব-হারাদের যে সব ছবি তাঁর বহু কবিতায় ও গল্পে ফুটে উঠেছে তার অধিকাংশই তিনি তাঁর ব্যবহারিক জীবন থেকেই পেয়েছেন—নিপুণভাবে অনুসন্ধান করলেই তার বাস্তব ভিত্তির সন্ধান মেলে।

---

* রথের মেলা ও স্নানযাত্রার মেলায় এক পয়সার বাঁশী বাজিয়ে ছেলেদের আনন্দ—এর অভিজ্ঞতাও তাঁর শিলাইদহে গোপীনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত রথ ও স্নান যাত্রার মেলা দেখে।

তাঁর 'দুই বিঘা জমি' অতি বিখ্যাত ও বহুপঠিত কবিতা। এর করুণ কাহিনীর মাল-মশলা যে তিনি শিলাইদহ গ্রাম থেকেই পেয়ে হুবহু চিত্রিত করেছেন, ভাল রকম অনুসন্ধান ক'রে সেই সত্য কাহিনীটাই আজ বলব। কবির জীবিত কালে আমার এই রকম কয়েকটি ধারণার কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করবার খুবই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সে সময় ও সুযোগ পাই নি।

শিলাইদহ যে তাঁর অতি প্রিয় স্থান ছিল, তাঁর 'সাহিত্য-রস-সাধনার তীর্থস্থান ছিল', তা অনেকেই জানেন। সেকালের শিলাইদহের অনেক দৃশ্য, অনেক চরিত্র নানা ভাবে তাঁর জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতে তাঁর সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান পেয়েছে। তাই সেকালের শিলাইদহের অনেক মানব-মানবীকে তাঁর কবিতা ও গল্পের মধ্যে হুবহু দেখতে পাই।

রবীন্দ্র-চরিতকার প্রভাতবাবু 'বোষ্টমী' গল্পের রচনা-স্থান সাজাদপুর ব'লে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু বৈষ্ণবী যে শিলাইদহেরই কোন সেকেলে অধিবাসিনী তাতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। আমরা দেখেছি সেই বৈষ্ণবী তার নাম করলেই "গৌর গৌর" ব'লে কপালে হাত তুলে প্রণাম করত এবং কবির কুঠী-বাড়ীতে ও বোটে তার অবাধগতি ছিল। 'বোষ্টমী' গল্প 'সবুজপত্রে' প্রথম প্রকাশিত হবার পরেই শিলাইদহের 'সর্ব্বক্ষেপী' সে বিষয় কোথায়ও জানতে পেরে তাঁর কাছে এসে

অনুযোগ ক'রে বলেছিল—"তুমি নাকি আমার কথা নিয়ে বই ছাপিয়েছ ?"*

'দুই বিঘা জমির' পটভূমিকা যে শিলাইদহ পল্লী, এর চরিত্র, ঘটনা সমস্তই যে এই গ্রামেরই কোন বাস্তব চিত্র, তার প্রধান প্রমাণই—

"রাখি হাটখোলা, নন্দীর গোলা, মন্দির করি পাছে,
তৃষাতুর শেষে পঁহুছিনু এসে আমার বাড়ীর কাছে।"

এই হাটখোলা, নন্দীর গোলা আর মন্দির,—সেকালের শিলাইদহ গ্রামের রাস্তা দিয়ে হেঁটে গ্রামের মধ্য দিয়ে আসতে হলে যে

* রবীন্দ্রনাথের "বোষ্টমী" গল্পের রচনাকাল ১৩২১ সাল, আষাঢ় মাস। প্রায় এই সময়েই বা কিছু পূর্ব্বেই শিলাইদহ গ্রামের ভদ্র সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বাস্তব অভিজ্ঞতার কিছু উল্লেখ এই গল্পে বেশ স্পষ্ট। গ্রামের ভদ্র-সম্প্রদায় সে সময় তাদের জমিদার রবীন্দ্রনাথের সংস্কারবর্জ্জিত অদ্ভুত জীবনযাত্রা, জমিদারীতে বাস, গ্রাম সংস্কার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে প্রচুর গবেষণায় মত্ত এবং তাঁর অনেক পল্লী-সংস্কার কাজে বাধা দানে উদ্যত। এই আচারনিষ্ঠ গোঁড়া ভদ্র সমাজের কাছে বোষ্টমীও কম নাকাল হন নি। ঐ গল্পে রবীন্দ্রনাথ "আনন্দী বৈষ্টমী" বলে বোষ্টমীর একটা ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন। তার প্রকৃত গৃহস্থাশ্রমের নাম আমরাও জানি না,—আমরা জানতাম তার নাম সর্ব্বক্ষেপী। রবীন্দ্রনাথ একজন ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের উল্লেখ করেছেন ছদ্মনামে বেণী গাঙ্গুলী।

কোন পথিককেই এই কয়টি স্থান পর পর অতিক্রম করতে হ'ত। হাটখোলা—শিলাইদহের কুঠীর-হাট, যা আজ পাঁচ-ছয় বছর হ'ল একেবারে পদ্মার উদরস্থ হয়ে গেছে,—এখন চিহ্নটিও নেই।* নন্দীর গোলা—সেকালের শিলাইদহের বিখ্যাত লালনচন্দ্র নন্দীর গোলা ; গ্রামমুখো রাস্তার একেবারে ধারে। তার পরেই মন্দির অর্থাৎ গোপীনাথ দেবের মন্দির। সেকেলে গোপীনাথের ছুটো মন্দিরই অনেক দূর থেকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করত, কারণ তখন গোপীনাথ বাড়ীর সিংহদরজা তৈরী হয় নি, রাজা সীতারাম রায়ের আমলে তৈরী এই মন্দির ছুটোই গ্রামের কেন্দ্রস্থলের নিশানা ছিল।

'ছুই বিঘা জমির' 'বাবু' আর 'উপেন' এই ছুটি চরিত্র আলোচ্য। তিনি কোন কল্পিত বড়লোকের নাম দেন নি—'বাবু' আর 'রাজা' ব'লেই খাঁটি চরিত্রটিকে এঁকেছেন, কারণ শিক্ষিত বা অশিক্ষিত ধনীরাই গরীবদের কাছে 'বাবু' বা 'রাজা' নামে অভিহিত হয়, আর 'উপেন' ঐ সত্য মানুষটার ছদ্মনাম মাত্র।

এই কবিতার সত্য ঘটনা ও পটভূমিকায় শিলাইদহের প্রাচীন ইতিহাসের যে ক্ষুদ্র অধ্যায়টুকু চিত্রিত হয়েছে, সেই-টুকুই বলব—অবশ্য কবি সে ঘটনাকে প্রাণের প্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ ক'রে সোনার রঙে এঁকে রেখে গেছেন।

শিলাইদহের সেকালের অধিকারী পরিবার সর্ব্ববিষয়ে

গ্রামে প্রাধান্য পেয়েছিলেন। অধিকারী বাড়ী 'বড় বাড়ী' ব'লে আজও পরিচিত। সে সময় অধিকারী বংশে হরচন্দ্র ও গুরুচরণই ছিলেন বড় কর্ত্তা আর মেজ কর্ত্তা। তবে মেজ কর্ত্তা গুরুচরণই ছিলেন অতি বৈষয়িক, বুদ্ধিমান ও অসাধারণ প্রতিপত্তিশালী। তিনিই অধিকারীদের সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করতেন আর পারিবারিক সব বিষয়েই কর্তৃত্ব করতেন, গ্রামেরও নেতৃত্ব করতেন কাঞ্চন-কৌলিন্য-প্রভাবে।

সেকালে অধিকারী-বাড়ী একালের মত অত বড় ছিল না। পরিবার বৃদ্ধি ও বাগান-বাগিচার জন্য তাঁরা আশে পাশের কয়েকজন গরীবগৃহস্থের বসত বাড়ী তাঁদের বাড়ীর সামিল ক'রে বাড়ীর আয়তন বাড়িয়েছিলেন। তালুক ও বহু জোতজমা থেকেও তাঁরা প্রমাণ করেছিলেন—

"এ জগতে হায়, সেই বেশী চায় আছে যার ভূরি ভূরি,
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।"

অধিকারী পরিবারের প্রবলপ্রতাপান্বিত মেজ কর্ত্তা গুরুচরণ তাঁদের ভদ্রাসন পাকাবাড়ী, চণ্ডীমণ্ডপ, বৈঠকখানা, ভিন্ন-ভিন্ন সরিকের অন্দরমহল, বাগ-বাগিচার জন্য যে দু'তিনজন গরীব দু'বিঘার মালিককে উচ্ছেদ করলেন, তাদের অন্যতম ছিল যদু দত্ত। এই যদু দত্তই রবীন্দ্রনাথের ছদ্মবেশী উপেন। জমিদারী সেরেস্তার অতি পুরানো জরিপী কাগজ চিঠা ইত্যাদিতে এখনো তাদের নাম পাওয়া যাবে। এই ছদ্মনামধারী যদু দত্তই

গুরুচরণের সর্ব্বগ্রাসী প্রস্তাবে 'সজল চক্ষে, বক্ষে জুড়িয়া পাণি' বলেছিল—"চেয়ে দেখ মোর আছে বড় জোর মরিবার মত ঠাঁই।"

গুরুচরণ অধিকারীর দালানের পার্শ্বস্থ বাগানের ধারেই গরীব যদু দত্ত ছোট একখানা খড়ের কুটিরে সস্ত্রীক বাস করত। গুরুচরণের কাছে তার সামান্য কিছু দেনা ছিল,—পল্লীগ্রামের গরীব গৃহস্থদের ধনী প্রতিবেশীর কাছে যেমন হয়ে থাকে।

গুরুচরণের প্রস্তাবে যদু দত্ত কিছুতেই কিছু টাকা নিয়ে অন্যত্র চ'লে যেতে রাজী না হয়েই—"সজলচক্ষে করুন রক্ষে গরীবের ভিটাখানি" ব'লে—বাবুর দয়া ভিক্ষা করেছিল। কিন্তু বৈষয়িক প্যাঁচে, দেনার দায়ে ফেলে গুরুচরণ "করিল ডিক্রী সকল বিক্রী মিথ্যা দেনার খতে।" তাই গরীব যদু দত্ত স্ত্রীর হাত ধ'রে 'সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ' সেই 'সোনার বাড়া' দু'বিঘা জমি থেকে বঞ্চিত হয়ে পথে বের হ'ল। দরদী কবি তাই লিখলেন—

"তাই লিখি দিল বিশ্ব নিখিল, দু'বিঘার পরিবর্ত্তে।"

যদু দত্ত গৃহী হলেও জাতে বৈষ্ণবই ছিল। কারণ তার স্ত্রীর নাম ছিল সখী বৈষ্ণবী—যদুর কণ্ঠী-বদল-করা বৌ। যদু নাকি তার স্ত্রীকে আদর ক'রে ডাকত—'সখী সুন্দরী'। বৈষ্ণব বৈষ্ণবী যদু ও সখী দু'জনে ঘরছাড়া পথচারী সর্ব্বহারা

হয়ে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগল। রবীন্দ্রনাথ তাই অপরূপ করুণায় লিখলেন—

"সন্ন্যাসিবেশে ফিরি দেশে দেশে হইয়া সাধুর শিষ্য"—ইত্যাদি

পথচারী বৈষ্ণব যদু দত্ত বারো-তেরো বছর পরে নানা তীর্থে ঘুরে সাত পুরুষের ভিটা-মাটির মায়ায় ঘুরতে ঘুরতে তার বাড়ী এসেছিল সস্ত্রীক। এইখানে কবি তার গ্রাম-প্রবেশের রাস্তার বর্ণনায় প্রথমে "কুমোরের বাড়ী দক্ষিণে ছাড়ি' রথতলা করি বামে"—একটু রং ফলিয়ে লিখে পল্লীসৌন্দর্য্যের চমৎকার একটি ছবি এঁকেছেন নিপুণ শিল্পীর তুলিতে। "রাখি হাটখোলা নন্দীর গোলা মন্দির করি পাছে"ই যদুর পরিত্যক্ত বাটীতে আসবার ঠিক রাস্তা।

শিলাইদহ গঙ্গাতীরে নয়, পদ্মাতীরে। গঙ্গার ঝঙ্কার বেশী, হিন্দুর তীর্থ, তাই বোধ হয় পদ্মার তীরের পরিবর্ত্তে গঙ্গাকেই স্থান দিয়েছেন, তবু পদ্মাও গঙ্গা।

পনেরো-ষোল বছর পরে তার বাড়ীর মায়া ঘরমুখো বাঙালীর মত তাকে খুবই ব্যাকুল করেছিল—তাতেই আম কুড়োনো বা অন্য কোন অপরাধে সে মেজবাবু গুরুচরণের কাছে লাঞ্ছিত হয়েছিল, এটাও সত্য। তাই এখনো ঐ স্থানটার নাম 'যদু দত্তের বাগান' বলা হয়। যদু তার বড় সাধের সেই আমগাছের দু'একটা আম যে কুড়িয়েছিল তাও বেশ অনুমান করা যেতে পারে।

গুরুচরণ অধিকারীকে 'বাবু' এবং 'রাজা' বলা বেশ শোভনই হয়েছে, কারণ সেকেলে চলতি ফ্যাসানে তিনি বেশ একটু বিলাসী ছিলেন। সব সময়ে চটি জুতো পায়ে ধব্ধবে থান কাপড় প'রে তিনি থাকতেন, দেখতেও সুপুরুষ ছিলেন। অধিকারী বাড়ীর কর্ত্তা ও অর্থশালী বৈষয়িক লোক হিসাবে তাঁর যে অসীম প্রতাপ ছিল, তাতে যদু তাঁকে 'রাজা' বলতে দ্বিধাই করতে পারে না। ধনী গুরুচরণ প্রায়ই তাঁর অনুগত পাশাখেলার পারিষদ পরিবৃত হয়ে থাকতেন। তাঁর মাছ ধরার সখও ছিল—বাড়ীরই নূতন পুকুরে।

গেরুয়াপরা সখী বৈষ্ণবীর সাথে ঝোলা কাঁধে সন্ন্যাসি-বেশেই যদু বারো-চৌদ্দ বছর পরে গ্রামে এসেছিল। গুরুচরণের কাছে লাঞ্ছিত হয়ে সে শেষে এই গ্রামেই এক বাড়ীতে থাকত আর গোপীনাথ দেবের প্রসাদ খেত। সাত পুরুষের ভিটা দুই বিঘা জমির মায়া তাকে সন্ন্যাসের পথ থেকে ফিরিয়ে এনেছিল। তার মত বৈষ্ণব-বেশী দরিদ্র যে রবীন্দ্রনাথের দেখা পেয়েছিল, তার করুণ-কাহিনী তাঁকে শুনিয়েছিল এটা খুবই স্বাভাবিক। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ তরুণ জমিদার হলেও বাউল, বৈষ্ণব, গৃহহীন ফকিরদের ডেকে তাদের গান শুনতেন, তাদের জীবন-কাহিনী শুনবার জন্যও তাঁর খুব আগ্রহ ছিল। ১৩০১—২ সালে অনেক সময় তিনি শিলাইদহে থাকতেন এবং 'কথা ও কাহিনী'র

অনেক কবিতাই শিলাইদহে লেখা হয়েছিল, তারো বিশিষ্ট প্রমাণ মেলে।

গুরুচরণ অধিকারীও রবীন্দ্রনাথের অপরিচিত ছিলেন না, কারণ শিলাইদহের অধিকারী-পরিবার বৈষয়িক ও নানা জনহিতকর কাজে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নানা ভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। তাঁর শিলাইদহের কুঠী-বাড়ী ভবন তৈরী হয়েছিল অধিকারীদের এবং আরো কয়েকজন গ্রামবাসীর জমি কিনে তারই উপর। অধিকারী বংশের অনেকেই ঠাকুর-বাবুদের শিলাইদহ, সাজাদপুর ও কালীগ্রাম কাছারীতে চাকরী করেছেন, এই লেখকও প্রায় পনেরো বছরের উপর চাকরী করেছে।, অধিকারীরা তাঁদের অনুগতও ছিলেন খুব, আবার ঠাকুর-বাবুদের সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদিও করেছেন কম নয়। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে অধিকারীদের বৈশিষ্ট্য ছিল খুব বেশী রকম। তিনিই অধিকারীদের গাছ-কাটা মোকদ্দমা হাইকোর্টে আপীল হবার সময় আপোষে নিষ্পত্তি ক'রে দিয়েছিলেন।